মহান মে দিবস
শ্রমজীবী মানুষের অধিকার এবং সরকারের উদ্যোগ

মো. আকতারুল ইসলাম

"শ্রমিক-মালিক ভাই ভাই, সোনার বাংলা গড়তে চাই" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে দেশে পালিত হচ্ছে মহান মে দিবস। মহান মে দিবস শ্রমজীবী মানুষের অধিকার আদায়ের আলোকবর্তিকা। ১৮৮৬ সালের এই দিনে যুক্তরাষ্ট্রের শিকাগো শহরে শ্রমের মর্যাদা, শ্রমের মূল্য এবং দৈনিক আট ঘন্টা কাজের দাবিতে আন্দোলনে শ্রমিকেরা যে আত্মাহুতি দিয়েছিলেন তাদের আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সারা বিশ্বব্যাপী এ দিবসটি পালিত হয়। এখানে শ্রমিক এবং মালিকের চেতনার জায়গাটি প্রসারিত হয়। পারস্পরিক সম্পর্ক আরো সুদৃঢ় হয়। শ্রমিক মালিকের সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক, সুষ্ঠু কর্মপরিবেশের প্রয়োজনীয়তা অনুভব করে এ বছর মে দিবসের প্রতিপাদ্য নির্বাচন করা হয়েছে। টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাকে টার্গেট করে সোনার বাংলা গড়তে উন্নত কর্মপরিবেশ, শ্রমিক-মালিকের সুসম্পর্ক, তাদের অধিকার, পেশাগত নিরাপত্তা ও সুস্থতা নিশ্চিতকরণের কোনো বিকল্প নেই। এ প্রেক্ষাপটে এবারের প্রতিপাদ্য যথার্থ।

শ্রমজীবী মানুষের অধিকার স্বার্থ ও কল্যাণের সাথে মহান মে দিবসের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য ওতপ্রোতভাবে জড়িত। শোষণ, বঞ্চনা, লাঞ্ছনা থেকে মুক্তির দীপ্ত শপথে বিশ্বব্যাপী দিনটি পালিত হয়। দিনটি সরকারি ছুটির দিন। প্রতি বছরের ন্যায় এবারো শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের অধিকার আদায়ের দিনে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। বাংলাদেশ তার জন্মলগ্ন থেকেই আন্তর্জাতিক রীতিনীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল। গৌরবময় মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে স্বাধীনতা লাভের পরেই ১৯৭২ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (আইএলও) এর সদস্যপদ লাভ করে। বাংলাদেশ ১৯৭২ সালের ২২ জুন আইএলসি সম্মেলনে ৬টি কোর-কনভেনশনসহ ২৯টি কনভেনশন অনুসমর্থন করে। বঙ্গবন্ধু শ্রমজীবী মেহনতি মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে আত্মত্যাগকারী শ্রমিকদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে এদিন সরকারি ছুটি ঘোষণা করেন।

শিল্পায়ন, শিল্পের উৎপাদন তথা অর্থনৈতিক উন্নয়নে প্রথম প্রয়োজন শ্রমজীবী মেহনতি মানুষ। শ্রমিক উৎপাদনের অপরিহার্য উপাদান, যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের মধ্যে নিহিত থাকে দেশের সম্ভাবনাময় ভবিষ্যৎ। দেশের সম্ভাবনা এবং শ্রমজীবী মানুষের সুযোগ সুবিধার কথা বিবেচনা করে অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বাংলাদেশ শ্রম আইন ২০০৬ কে যুগোপযোগী করা হয়েছে। এ বছরই আরো প্রয়োজনীয় সংশোধন আনা হচ্ছে। দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ২০১৫ সালে শ্রমবিধিমালা প্রণয়ন করা হয়েছে। নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিতের লক্ষ্যে ২০১৩ সালে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা এবং গৃহকর্মীদের প্রতি লাঞ্ছনা, বঞ্চনা ও নির্যাতন বন্ধের লক্ষ্যে গৃহকর্মী সুরক্ষা ও কল্যাণনীতি ২০১৫ প্রণয়ন করা হয়েছে। শ্রমিকের ন্যায্য মজুরি নিশ্চিতকরণের জন্য সরকার ৩৯টি খাতের ওয়েজবোর্ড গঠন করেছে। প্রতিটি কারখানায় তাদের অধিকার আদায়ে তারা যাতে সচেষ্ট থাকে, তারা যাতে অধিকার বঞ্চিত না হয় সেজন্য ট্রেড ইউনিয়নের নিবন্ধন সহজতর করা হয়েছে।

শ্রমিকদের স্বার্থ যাতে বিঘ্নিত না হয় সেজন্য সরকার প্রতিটি কারখানাকে পরিদর্শনের আওতায় আনার চেষ্টা করছে। কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হয়েছে। সম্প্রতি শ্রম পরিদপ্তরকে অধিদপ্তরে উন্নীত করা হয়েছে। সব কারখানায় সেইফটি কমিটি গঠন এবং যে কোনো প্রকার বিরোধ নিস্পত্তিতে সামাজিক সংলাপের উদ্যোগ নিয়েছে। সব শিল্পসেক্টরে শ্রমিক-মালিক, সরকার ত্রিপক্ষীয় কমিটি কাজ করেছে। এর পরেও বাংলাদেশের অর্থনীতির মূল চালিকাশক্তি তৈরি পোশাকশিল্পের লক্ষ লক্ষ শ্রমিকের স্বার্থের কথা বিবেচনা করে ২০১৭ সালে শুধু গার্মেন্টস শিল্পের জন্য আলাদা ত্রিপক্ষীয় কমিটি গঠিত হয়েছে।

প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতে নিয়োজিত শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য সরকার শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল গঠন করেছে। দুর্ঘটনায় শ্রমিকের মৃত্যু হলে, কোনো শ্রমিক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হলে কিংবা তাদের ছেলেমেয়ের উচ্চশিক্ষা, নারী শ্রমিকদের মাতৃত্বকালীন সহায়তা এ তহবিল থেকে প্রদান করা হচ্ছে। শ্রম ও কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয়ের অধীন শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশনের নির্দিষ্ট ফরমে আবেদন করে এ সকল সুবিধা গ্রহণের জন্য শ্রমিকদের প্রতিনিয়ত উৎসাহিত করা হচ্ছে। এ তহবিলে প্রায় তিনশ' কোটি টাকার অর্থ জমা রয়েছে।

সরকার গার্মেন্টস শ্রমিকদের কল্যাণের জন্য ভিন্ন একটি তহবিল গঠন করেছে যার নাম কেন্দ্রীয় তহবিল। গার্মেন্টসকর্মীদের দুর্ঘটনাজনিত মৃত্যু, দুরারোগ্য ব্যাধির চিকিৎসা, মাতৃত্বকালীন সহায়তা, তাদের সন্তানদের উচ্চশিক্ষায় সহায়তা এমন কি তাদের বিমার দাবিও এ খাত থেকে পরিশোধ করা হচ্ছে। বিজিএমইএ এবং বিকেএমইএ'র সদস্যভুক্ত কারখানাগুলোর সব শ্রমিককে কেন্দ্রীয় ডাটাবেইজের আওতায় আনা হচ্ছে। এতে করে শ্রমিকদের যে কোনো সহায়তার প্রয়োজনে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণ করা যাবে। বলা হচ্ছে, প্রতিটি শ্রমিক ডাটাবেইজের আওতায় আসলে যে কোনো প্রয়োজনে অতি দ্রুত সহায়তা প্রদান করা যাবে, ফলে কোনো শ্রমিকই অসহায় থাকবে না। সুস্থ কর্মপরিবেশে কাজ করা শ্রমিকদের অধিকার। শ্রমিক অসুস্থ থাকলে উৎপাদনে দারুণভাবে ব্যাঘাত ঘটে। পেশাগত অনেক অসুখ শ্রমিকদের মৃত্যু ঝুঁকি বাড়িয়ে দেয়। যেমন- সিলোকোসিস। শ্রমিকদের পেশাগত অসুখের চিকিৎসায় সরকার পিপিপি'র আওতায় নারায়ণগঞ্জে তিনশ' শয্যার পেশাগত বিশেষায়িত হাসপাতাল নির্মাণ করছে। তিনশ' শয্যার হাসপাতালে একশ' শয্যা থাকবে শ্রমিকদের জন্য সংরক্ষিত। শ্রমিকরা নামমাত্র খরচে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের চিকিৎসা নিতে পারবে। শুধু তাই নয়, শ্রমিকের পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নিশ্চিতের জন্য- অকুপেশনাল সেইফটি এন্ড হেলথ-ওএইচএস (Occupational Safety and Health-OSH) একাডেমি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেছে শ্রম মন্ত্রণালয়।

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রাকে সামনে রেখে ২০২১ সালের মধ্যে ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসনে সরকার বদ্ধপরিকর। ২০২৫ সালের মধ্যে সকল প্রকার শিশুশ্রম নিরসনে জাতীয় কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। প্রতিযোগিতামূলক বিশ্বায়নের এ যুগে উৎপাদন প্রক্রিয়ায় উন্নত প্রযুক্তির ব্যবহার ও উৎপাদনের সঙ্গে জড়িত শ্রমিকদের দক্ষতা বৃদ্ধি অপরিহার্য। দেশের বাইরেও দক্ষতার অভাবে বাংলাদেশি শ্রমিকরা অন্য দেশের শ্রমিকদের থেকে কম মজুরি পায়। আবার দেশের গার্মেন্টস সেক্টরে দক্ষ শ্রমিকের অভাবে ব্যবস্থাপনার পদগুলো ভারত, শ্রীলংকাসহ কয়েকটি দেশের দখলে, ফলে প্রতিবছর কয়েকশ' কোটি টাকা চলে যাচ্ছে দেশের বাইরে। বাস্তব অবস্থা বিবেচনায় বিভিন্ন ট্রেডের শ্রমিকদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন কাউন্সিল-এনএসডিসি। যাতে দেশে ও দেশের বাইরে আমাদের শ্রমিকরা সব সেক্টরে দক্ষতার স্বাক্ষর রাখতে পারে, দেশের অগ্রযাত্রায় ভূমিকা রাখতে পারে।

দেশের সুবিশাল শ্রমজীবী মানুষের যথাযোগ্য মর্যাদা ও অধিকার নিশ্চিতকরণ, নিরাপদ কর্মপরিবেশ, শিশুশ্রম নিরসন, ন্যায্য মজুরি নির্ধারণ, শ্রমিক-মালিক সুসম্পর্কের মধ্য দিয়ে টেকসই উন্নয়ন নিশ্চিত করা এবং উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ গড়াই হোক এবারের মে দিবসের অঙ্গীকার।

#

৩০.০৪.২০১৮ পিআইডি প্রবন্ধ

রোগ প্রতিরোধে লবণের সীমিত ব্যবহার

জিনাত আরা আহমেদ

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি)'র তৃতীয় লক্ষ্যমাত্রা হলো সুস্বাস্থ্য,অর্থাৎ স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন নিশ্চিত করা ও সব বয়সি মানুষের কল্যাণে কাজ করা। কিন্তু বর্তমানে সুস্থ মানুষ পাওয়া কঠিন। দেখা যায়, স্বাস্থ্যগত বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে প্রায়ই ডাক্তারের কাছে যেতে হচ্ছে। এসবের কারণ খুঁজলে দেখা যাবে,মূলত আমাদের অস্বাস্থ্যকর জীবনযাপন এর জন্য দায়ী। আমাদের বেশির ভাগই শারীরিক সুস্থতা নিয়ে সচেতন নয়। কোন খাবার আমাদের জন্য ক্ষতিকর, কোনটাতে শরীরের কি ক্ষতি হচ্ছে তার কোনো স্বচ্ছ ধারণা নেই। যেন শুধু স্বাদের জন্য আমরা খাবার গ্রহণ করি। অথচ খাবারের মূল উদ্দেশ্য হলো সুস্থভাবে বেঁচে থাকা। সুস্থতার অন্যতম প্রতিবন্ধক খাবারে মাত্রাতিরিক্ত লবণের ব্যবহার। স্বাস্থ্যকর জীবনযাপনে অসংক্রামক রোগ প্রতিরোধে লবণের পরিমিত ব্যবহার সম্পর্কে জানতে হবে।

খাবারে অপরিমিত লবণের ব্যবহার আমাদের সুস্থতার জন্য বড়ো চ্যালেঞ্জ। লবণ খাবারের স্বাদকে বহুগুণ বাড়িয়ে দেয়। আকর্ষণীয় খাবার যেমন- ফাস্টফুড, চটপটি, কেচাপ, সস, আচার, নানা ধরনের মশলাযুক্ত খাবারে লবণ হলো প্রধানতম আকর্ষণ। আমাদের দেশের রান্নায় তেল, মশলা এবং লবণ যেন অপরিহার্য উপাদান। শৈশব থেকেই আমরা এ জাতীয় রান্না করা খাবারে অভ্যস্ত হয়ে যাই। খাবারে লবণের ব্যবহারতো আছেই, তারপর অনেকের আবার কাঁচা লবণ খাওয়ার অভ্যাস থাকে। এছাড়া সালাদ, আচার এসব খাবারের মাধ্যমেও কাঁচা লবণ খাওয়া হয়।

ফাস্ট ফুডের প্রতি আকর্ষণ স্বাস্থ্যের জন্য আরেক শঙ্কাজনক ইঙ্গিত। বিশেষ করে শিশু-কিশোররা বেশি মাত্রায় ফাস্টফুডের দিকে ঝুঁকে পড়ছে। এতে ব্যবহার হচ্ছে চর্বি জাতীয় তেল, মশলা এবং সেই সাথে লবণ ও টেস্টিং সল্ট, খাবারকে সুস্বাদু এবং আকর্ষণীয় করতে যার জুড়ি নেই। অথচ এটা হৃদরোগের জন্য বেশ ক্ষতিকর। বর্তমান প্রজন্মের কর্মক্ষমতা এবং দীর্ঘজীবন নিশ্চিত করতে লবণের সীমিত ব্যবহারের কোনো বিকল্প নেই। সারাদিনে চা চামচের এক চামচ পরিমাণ লবণ আমাদের জন্য যথার্থ। এর বেশি হলে তা স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর।

অতিরিক্ত লবণ গ্রহণে নানা ধরনের স্বাস্থ্যগত সমস্যা হয়। উচ্চ লবণযুক্ত খাবার গ্রহণ করলে পাকস্থলীর ক্যান্সার এবং কিডনির রোগ হওয়ার সম্ভাবনা বাড়ে। অতিরিক্ত লবণ গ্রহণ প্রস্রাবের মাধ্যমে ক্যালসিয়াম নির্গমণ বাড়িয়ে দেয়। ফলে আমাদের হাড়ের ক্যালসিয়াম ক্ষয়ে হাড় পাতলা হয়ে যায়। বয়স বাড়ার সাথে সাথে এই পাতলা হাড়গুলোর ভঙ্গুরতা বৃদ্ধি পায়, যা ভেঙে গেলে জোড়া লাগতে অনেক সময় লাগে। এছাড়া অতিরিক্ত লবণ গ্রহণে শারীরিক স্থূলতা এবং স্মৃতিবিভ্রাটের ঝুঁকি বাড়ে। উচ্চ লবণযুক্ত খাবার গ্রহণ করার ফলে রক্তচাপ ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। উচ্চ রক্তচাপ হৃদরোগ, স্ট্রোক এবং কিডনি রোগের প্রধান কারণ। হৃদরোগ এবং স্ট্রোক সারা বিশ্বে এক ঘাতক ব্যাধি। বিশ্বে প্রতি বছর প্রায় ১ কোটি ৭১ লক্ষ লোক এই রোগে মারা যায়। বাংলাদেশের এক চতুর্থাংশ মানুষ উচ্চ রক্তচাপে ভোগে। হৃদরোগ, স্ট্রোক, কিডনি রোগ, পক্ষাঘাত, অন্ধত্বসহ নানা ধরনের জটিল অসুখের জন্য উচ্চ রক্তচাপ বড়ো ধরনের রিস্ক ফ্যাক্টর বা ঝুঁকিপূর্ণ উপাদান হিসেবে কাজ করে।

অতিরিক্ত লবণ গ্রহণের ফলে আমাদের রক্তচাপ বৃদ্ধি পাওয়ায় স্ট্রোক, হার্ট অ্যাটাক, কিডনি ফেইলিয়র এবং হার্ট ফেইলিয়রের ঝুঁকি বেড়ে যায়। প্রাপ্ত বয়স্কদের শারীরিক অক্ষমতা এবং পক্ষাঘাতে আক্রান্ত হওয়ার সবচেয়ে বড়ো কারণ স্ট্রোক এবং হৃদরোগ। উচ্চ রক্তচাপের কারণে শতকরা ৩৯ ভাগ ক্ষেত্রে করোনারী হৃদরোগ এবং ৬১ ভাগ ক্ষেত্রে স্ট্রোক হয়ে থাকে। অনিয়ন্ত্রিত উচ্চ রক্তচাপ হার্টের কার্যক্ষমতা হ্রাস করে। বিশ্বের যেসব জনগোষ্ঠী লবণ কম খায় তাদের শতকরা ৮০ ভাগের উচ্চ রক্তচাপ থাকে না। লবণ কম গ্রহণ করলে বৃদ্ধ বয়সে উচ্চ রক্তচাপে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা কমে যায়।

ঘরে-বাইরে উচ্চ লবণযুক্ত খাবার পরিহার করতে কিছু নিয়ম মেনে চলতে হবে। রান্না করার সময় খাবারে অল্প লবণ ব্যবহার করতে হবে। খাবারের সাথে একেবারেই বাড়তি লবণ খাওয়া যাবে না। ফাস্টফুড, রেস্টুরেন্ট ও ক্যান্টিনের খাবারে প্রচুর লবণ থাকে, এজন্য এসব খাবার যথাসম্ভব বাদ দিতে হবে। টিনজাত স্যুপ, সবজি, মাছ, মাংস এবং প্রক্রিয়াজাত খাবার, পনির যথাসম্ভব এড়িয়ে চলা উচিৎ। খাদ্য সংরক্ষণ করার জন্য লেবুর রস, ভিনেগার, কাঁচা রসুন, মসলা ব্যবহার করা যেতে পারে। খাবারকে সুস্বাদু করার জন্য বিভিন্ন জিনিস যেমন-কেচাপ, সয়াসস, সালাদ জাতীয় উপকরণ কম ব্যবহার করলে লবণ কম খাওয়া হবে। শুঁটকি মাছ, আচার জাতীয় খাবার কম খান। লবণবিহীন ক্র্যাকার্স, পপকর্ণ এবং বাদাম খাওয়া যেতে পারে। কাঁচা ফলমূল, শাক-সবজি খাওয়ার সময় লবণ পরিহার করতে হবে। একেবারে কম লবণ দিয়ে সম্ভব হলে বাড়িতেই সস, কেচাপ, আচার, সালাদ বা অন্যান্য খাবার তৈরি করতে পারলে সুস্বাস্থ্য বজায় রাখা সম্ভব।

#

৩০.০৪.২০১৮ পিআইডি প্রবন্ধ

২৮ এপ্রিল জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস উপলক্ষে বিশেষ ফিচার

জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস
শ্রমিকের স্বাস্থ্য ও নিরাপদ কর্মপরিবেশের অঙ্গীকার

মো. আকতারুল ইসলাম

"সুস্থ শ্রমিক, নিরাপদ জীবন-নিশ্চিত করে টেকসই উন্নয়ন" এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ২৮ এপ্রিল পালিত হতে যাচ্ছে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবস। এ বছর নিয়ে তৃতীয়বারের মতো জাতীয়ভাবে এ দিবসটি পালন করছে সরকার। পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা-২০১৩ এর নির্দেশনা অনুযায়ী পেশাগত স্বাস্থ্য ও সুরক্ষা সম্পর্কে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য এ দিবসটি পালিত হচ্ছে।

অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের মূল চালিকাশক্তি হলো শ্রমিক-মালিক ও বিভিন্ন পর্যায়ের শ্রমজীবী মানুষ। বাংলাদেশ ইতোমধ্যে উন্নয়নের মহাসড়কে প্রবেশ করেছে। বর্তমান সরকার টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের জন্য কাজ করে যাচ্ছে। মধ্যম আয়ের দেশ হিসেবে নিজের অবস্থান সুসংহত করেছে। টেকসই উন্নয়নের জন্য টেকসই শিল্পায়নের কোনো বিকল্প নেই। টেকসই উন্নয়নের অগ্রযাত্রার লক্ষ্যে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি দিবসের এবারের প্রতিপাদ্য যথার্থ।

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, ২০১৩ সালে মর্মান্তিক রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানি সংকটে পড়ে। বাংলাদেশের কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তা প্রশ্নবিদ্ধ হয়ে পড়ে। এ বিষয়টি বিবেচনায় নিয়ে সরকার ২০১৩ সালে দ্রুততম সময়ের মধ্যে ২০০৬ সালের বাংলাদেশ শ্রম আইন সংশোধন করে কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি সংশ্লিষ্ট ধারাগুলো যুগোপযোগী করে। সরকার ঐ বছরই কর্মক্ষেত্রে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটির গুরুত্ব, স্টেকহোল্ডারদের ভূমিকা ও দায়িত্ব স্পষ্ট করে জাতীয় পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি নীতিমালা প্রণয়ন করে। রানা প্লাজা দুর্ঘটনা পরবর্তী সময়ে কারখানা পরিদর্শন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সময়ের চাহিদায় মাত্র নয় মাসের মধ্যে কলকারখানা ও প্রতিষ্ঠান পরিদর্শন পরিদপ্তরকে অধিদপ্তর করা হয়। বিগত ৫ বছরে এ সংস্থায় প্রায় এক হাজার জনবল নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। মাত্র কয়েক বছরের ব্যবধানে বাংলাদেশে কর্মক্ষেত্রের নিরাপত্তার বিষয়ে অভূতপূর্ব উন্নয়ন হয়েছে। কারখানার কর্মপরিবেশ, শ্রমিক-মালিক সম্পর্ক স্থাপন, শ্রমিকের স্বাস্থ্য সুরক্ষা, শ্রমিকের অধিকার আদায়ে সর্বোপরি শান্তিপূর্ণ পরিবেশে উৎপাদন বৃদ্ধিতে কলকারখানা অধিদপ্তর অপরিহার্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। কলকারখানা পরিদর্শন কার্যক্রমে গতিশীলতা, স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতা আনয়নের জন্য লেবার ইন্সপেকশন ম্যানেজমেন্ট এপ্লিকেশন-লিমা (Labour Inspection Management Application -LIMA) অ্যাপস চালু করা হয়েছে।

শ্রম পরিদর্শকগণ মালিক-শ্রমিকের মধ্যে সেতুবন্ধন হিসেবে কাজ করছে। পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটির বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে আইন করে শ্রমিকদের শিশুদের জন্য ৪২৪৩ টি কারখানায় ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা হয়েছে। শ্রমিকের জন্য এখন পর্যন্ত যে কয়টি ভালো এবং গুরুত্বপূর্ণ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে, তার মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নারায়ণগঞ্জে শ্রমিকের চিকিৎসার জন্য তিনশ' শয্যার একটি হাসপাতাল নির্মাণ করা হচ্ছে। এ হাসপাতালে একশ' শয্যা শ্রমিকদের জন্য সংরক্ষণ করা হবে। নামমাত্র মূল্যে বিশেষায়িত এই হাসপাতালে শ্রমিকরা চিকিৎসা সুবিধা পাবেন।

পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটির বিষয়টিকে বিবেচনায় নিয়ে ৩৮টি কাজকে ঝুঁকিপূর্ণ ঘোষণা করা হয়েছে। বিগত কয়েক বছরে তৈরি পোশাকশিল্প এবং চিংড়িশিল্পকে শতভাগ শিশুশ্রম মুক্ত করা সম্ভব হয়েছে। এ বছরের মধ্যে আরো ১১টি সেক্টরে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে শিশুশ্রম নিরসনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

সম্প্রতি দু'টি খাত বেশি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে। একটি পাথর কোয়ারী এবং অন্যটি নির্মাণশিল্প। কখনো কখনো পাথর কোয়ারিতে শ্রমিক মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়। অন্যদিকে কোথাও না কোথাও নির্মাণ শ্রমিকের মৃত্যুর খবর পাওয়া যায়। নির্মাণ শ্রমিকদের একটু অসতর্কতার জন্য তাদের জীবন ঝুঁকির মধ্যে পড়ে। হেলমেট আর সেইফটি বেল্ট ব্যবহার করলে অনেকাংশে নির্মাণ শ্রমিকরা অনাকাঙ্ক্ষিত দুর্ঘটনা এড়াতে পারেন। পাথর কোয়ারী এবং নির্মাণশিল্পের সাথে পাথরভাঙ্গা শ্রমিকদের সচেতনতা বৃদ্ধিও দিনে দিনে আরো গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠছে। এসকল বিষয় আমলে নিয়ে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জন এবং পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ক নীতিমালাসমূহের যথাযথ বাস্তবায়ন, কর্মক্ষেত্রের উন্নয়ন এবং পেশাগত রোগ শনাক্তকরণ প্রতিরোধ ও প্রতিকার বিষয়ক গবেষণার জন্য পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি একাডেমি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। কারখানা মালিক শ্রমিকদের মধ্যে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির সাথে সাথে এ বিষয়ে মালিকদের আগ্রহ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সরকার এ বছর থেকে ১০টি কারখানাকে পেশাগত স্বাস্থ্য ও সেইফটি উত্তম চর্চা পুরস্কার ওএসএইচ গুড প্রাকটিস এওয়ার্ড (OSH Good Practice Award) প্রদান করবে।

বাংলাদেশ শ্রম আইনের আলোকে প্রাতিষ্ঠানিক ও অপ্রাতিষ্ঠানিক খাতের শ্রমিকদের সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতে সরকার শ্রমিক কল্যাণ ফাউন্ডেশন তহবিল গঠন করেছে। এ তহবিল থেকে দুর্ঘটনায় নিহত শ্রমিকদের স্বজনদের দুই লাখ, দুরারোগ্য রোগের চিকিৎসায় সর্বোচ্চ এক লাখ টাকা এবং শ্রমিকের সন্তানের উচ্চশিক্ষায় শিক্ষা সহায়তা প্রদান করছে।

এছাড়া গার্মেন্টস শিল্পে নিয়োজিত শ্রমিকদের জন্য গঠিত কেন্দ্রীয় তহবিল থেকে দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঘটলে সর্বোচ্চ তিন লাখ এবং দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত গার্মেন্টস শ্রমিকদের চিকিৎসায় দুই লাখ এবং তাদের সন্তানদের উচ্চশিক্ষায় সর্বোচ্চ তিন লাখ টাকা শিক্ষা সহায়তা প্রদান করছে।

মূলত: সরকার মালিক এবং শ্রমিকদের পারস্পরিক সহযোগিতায় কর্মক্ষেত্রে স্বাস্থ্য ও সেইফটির বিষয়ে সবার মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধি পেলে বাড়বে শ্রমিকের কর্মদক্ষতা। নিরাপদ কর্মপরিবেশে বাড়বে উৎপাদন, নিশ্চিত হবে টেকসই উন্নয়ন এর লক্ষ্যে আমরা কাজ করে যাবো- এই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

#

২৬.০৪.২০১৮ পিআইডি প্রবন্ধ

বাংলাদেশের নারীরা সাফল্যের সর্বোচ্চ শিখরে

ফারিহা হোসেন

সরকারের নারীবান্ধব নীতির ফলে বর্তমানে নারীদের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অবস্থান দৃঢ়। নারীরা কর্মক্ষেত্রে সাফল্যের সাথে কাজ করে চলেছে। নারীর ক্ষমতায়নে বিশ্বে বাংলাদেশ এখন রোল মডেল হিসেবে সমাদৃত এবং প্রশংসিত হচ্ছে। বর্তমানে দেশের প্রধানমন্ত্রী নারী, জাতীয় সংসদের স্পিকার নারী, বিরোধী দলীয় নেতা নারী, সচিব পদমর্যাদার নারী কর্মকর্তার সংখ্যা উল্লেখযোগ্য। অনুরূপ পুলিশ প্রশাসনে থানার ওসি, এএসপি, এসপি, ডিআইজি, অতিরিক্ত আইজিপি, উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা, জেলা প্রশাসক, বিভাগীয় কমিশনার পর্যায়েও কর্মরত আছেন বহু নারী কর্মকর্তা। স্ব-স্ব ক্ষেত্রে নারীরা তাদের সাফল্যের সাক্ষর রাখছেন। অর্থাৎ ভূমি থেকে মহাকাশ, এভারেস্টের সর্বোচ্চ চূড়ায় বিজয়ের পদচিহ্ন এঁকে চলেছেন বাংলাদেশের অদম্য এবং আলোকিত নারীরা। দেশের রাজনীতি, প্রশাসনে, সংসদে, ব্যবসা-বাণিজ্য থেকে শুরু করে ক্রীড়াঙ্গনে সাফল্য আর অগ্রযাত্রায় বিশ্বকে জয় করে হাতের মুঠোয় নিয়ে এসেছেন।

চিরসত্য কথা- একটি পরিবার, সমাজ, দেশ, জাতি নারী-পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টা ছাড়া উন্নতি-সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে যেতে পারে না। বাংলাদেশ যে উন্নয়নশীল দেশে এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে চলেছে এটা তারই একটি উল্লেখযোগ্য প্রমাণ।

বর্তমানে বাংলাদেশে সরকারি ও বিরোধী দুই দলের প্রধান এবং জাতীয় সংসদের স্পিকারও নারী। সংসদে বর্তমানে সংরক্ষিত নারী আসনে ৫০ জন এমপি রয়েছেন। এর মধ্যে আওয়ামী লীগের ৪২ জন, জাতীয় পার্টির ছয়জন এবং জাসদ ও ওয়ার্কার্স পার্টির একজন করে দুজন। এর বাইরে চলতি সংসদে ২২ জন নারী এমপি রয়েছেন, যারা জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত। সেনাবাহিনী, পুলিশ, আনসার, বিজিবিসহ সব ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ বাড়ছে। ক্রীড়াঙ্গনে একের পর এক সাফল্যের জোয়ার বয়ে আনছে বাংলাদেশের মেয়েরা। এরই ধারাবাহিকতায় সাফ অনূর্ধ্ব-১৫ মহিলা ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপের শিরোপা ঘরে তুলে নিয়েছে বাংলাদেশের তরুণীরা। সম্প্রতি ফাইনালে শক্তিশালী ভারতকে ১-০ গোলে হারিয়ে দেশের মানুষকে আনন্দ উপহার দেয় এই মেয়েরা। প্রতিযোগিতায় দাপটের সঙ্গে খেলেছে তারা। 'অপরাজিত চ্যাম্পিয়ন' তারই পরিচয় বহন করে। প্রতিযোগিতায় দুর্দান্ত খেলোয়াড়রা দেশের প্রমীলা ফুটবলকে যে অনেক দূর এগিয়ে নিয়ে যাবে, এতে কোনো সন্দেহ নেই।

সাউথ এশিয়ান গেমসে বাংলাদেশের দুই নারী অ্যাথলেট মাবিয়া আক্তার সীমান্ত ও মাহফুজা খাতুন শিলা ভারোত্তোলন ও সাঁতারে সোনা জয় করে দেশের জন্য বয়ে এনেছেন সম্মান। নারীর অগ্রযাত্রায় একজন উজ্জ্বল নক্ষত্র প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার কন্যা সায়মা ওয়াজেদ। তিনি সম্প্রতি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলের 'অটিজম বিষয়ক চ্যাম্পিয়ন' হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। সায়মা ওয়াজেদ বাংলাদেশে অটিজম বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে অনেক দিন ধরেই কাজ করে আসছেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ১১টি দেশে অটিজম মোকাবিলা ও জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য পরামর্শক হিসেবে কাজ করছেন তিনি।

মেধা ও পরিশ্রমের সমন্বয়ে যে কয়জন বাংলাদেশি নারী আন্তর্জাতিক অঙ্গনে সুপরিচিত, এর মধ্যে একজন সোনিয়া বশির কবির। টেক জায়ান্ট মাইক্রোসফট বাংলাদেশের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে তাঁকে নিয়োজিত করা হয়েছে বেশ আগেই। নতুন আরও তিনটি দেশ নেপাল, ভুটান ও লাওসের ব্যবস্থাপনা পরিচালক হিসেবে নিয়োজিত হয়েছেন তিনি। নতুন দায়িত্বে সামনের দিনগুলোতে এই চারটি দেশে মাইক্রোসফটের ডিজিটাল ট্রান্সফরমেশনের কাজ করবেন তিনি। এ লক্ষ্যে যাবতীয় ব্যবসায়িক সিদ্ধান্ত নেওয়াটা তার ওপরই নির্ভর করবে। মাইক্রোসফটে কাজের পাশাপাশি সোনিয়া বশির কবির জাতিসংঘের আওতাভুক্ত টেকনোলজি ব্যাংক ফর ডেভেলপড কান্ট্রিজের (LDCS) গভর্নিং কাউন্সিল মেম্বার হিসেবে কাজ করে চলেছেন। সম্প্রতি জাতিসংঘের জেনারেল অ্যাসেম্বলি সপ্তাহে সাসটেইনেবল ডেভেলপমেন্ট গোল (SDG) সংক্রান্ত সেরা ১০ পথিকৃতের একজন হিসেবে ইউএন গ্লোবাল কমপ্যাক্ট সোনিয়া বশির কবিরকে স্বীকৃতি দিয়েছে। বেশ কয়েক বছর ধরে বাংলাদেশে নারীর অগ্রযাত্রার পথে নতুন উদাহরণ সৃষ্টি করেছেন এই নারী।

সম্প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জাতীয় মহাকাশ সংস্থা নাসা থেকে 'ইনভেন্টর অব দ্য ইয়ার' হিসেবে মনোনীত হয়েছেন বাংলাদেশের মাহমুদা সুলতানা। ন্যানো মেটারিয়ালের ভূমিকা বৃদ্ধি করে মহাকাশে ব্যবহার উপযোগী অভিনব ডিটেক্টর যন্ত্রপাতির নির্মাণ কৌশল ও প্রয়োগ উদ্ভাবনের জন্য ২০১৭ সালে নাসার কনিষ্ঠ এই রিসার্চ ইঞ্জিনিয়ার 'ইনভেন্টর অব দ্য ইয়ার' নির্বাচিত হন। বর্তমানে তিনি বিভিন্ন ন্যানোটেক কাউন্সিলে নাসার প্রতিনিধিত্ব করছেন। সাত বছর ধরে নানা রকম প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও কঠিন পরিবেশের সঙ্গে লড়াই করে জাতিসংঘ শান্তি রক্ষা মিশনে যোগ দিয়েছেন বাংলাদেশের দুজন নারী বৈমানিক ফ্লাইট লেফটেন্যান্ট নাইমা হক ও তামান্না-ই-লুতফী। চলার পথের সব বাধা উপেক্ষা করে নারীদের প্রতিনিয়ত এগিয়ে যাওয়ার এক অপূর্ব দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন তারা।

আমাদের অদম্য, আলোকিত নারীরা এভাবেই একে একে বুনেছেন সফলতার গল্প আর পাশাপাশি দেশের জন্য নিয়ে এসেছেন জয়ের বার্তা। আকাশ ছোঁয়ার স্বপ্নকে ছুঁয়ে দেখার বাস্তবতায় কঙ্গোর অচেনা আকাশকেও হার মানিয়েছে অদম্য অপরাজিতাদের হাত। জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা মিশনে আইভরিকোস্টে মেডিকেল কন্টিনজেন্ট কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন প্রথম বাংলাদেশি নারী কর্নেল নাজমা বেগম।

অভিজ্ঞতার কথা তুলে ধরে সম্প্রতি তিনি সংবাদ মাধ্যমকে বলেন, 'প্রথম নারী হিসেবে মিশনে মেডিকেল কন্টিনজেন্ট কমান্ডার হিসেবে দায়িত্ব পালন করা আমার জন্য ছিল রীতিমতো চ্যালেঞ্জ। প্রত্যন্ত জনমানবহীন গ্রামে অনেক সময় ভারী অস্ত্র ছাড়াই হাসপাতালে দায়িত্ব পালন করতে হতো আমাদের। আমি নিজের অভিজ্ঞতা থেকে দেখেছি, নারীরা পুরুষদের চেয়ে কোনো অংশে কম নয়ই, বরং অনেক ক্ষেত্রে বেশি।' হিমালয়ের সর্বোচ্চ শৃঙ্গ এভারেস্টও দুর্গম নয় বাঙালি নারীদের কাছে। প্রথম বাংলাদেশি নারী হিসেবে বিশ্বের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্টে লাল-সবুজ পতাকা মেলে ধরেছেন নিশাত মজুমদার। এরপর আরেক বাংলাদেশি নারী ওয়াসফিয়া নাজরীনও এভারেস্টের বুকে এঁকে দেন বিজয়ের পদচিহ্ন।

বাংলাদেশের সাহসী নারীদের ধারাবাহিক সাফল্যের প্রতিটি পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে অসাধারণ বীরত্বের গল্প। এরকমই একজন দেশের প্রত্যন্ত জেলা ঝালকাঠির মেয়ে শারমীন। নানা বাধা-বিপত্তির পর ২০১৫ সালের ১৬ আগস্ট সহপাঠী নাদিয়ার সহযোগিতায় মা ও কথিত স্বামীর বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা করে শারমিন। স্কুল পড়ুয়া শারমিনের এই অদম্য সাহসিকতার জন্য যুক্তরাষ্ট্রের 'ইন্টারন্যাশনাল উইমেন অব কারেজ (আইডব্লিউসি) ২০১৭' পুরস্কারে ভূষিত করা হয় শারমিনকে। মার্কিন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ২০০৭ সাল থেকে সাহসিকতার জন্য নারীদের জন্য সম্মানসূচক এই পুরস্কার দিয়ে আসছে। শত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে লড়াই ও সংগ্রামের মধ্যদিয়ে নতুন করে আবার জীবন শুরু করা শারমিনের লক্ষ্য, দেশ থেকে বাল্যবিবাহ নামের বিষবৃক্ষের গোড়া সমূলে উৎপাটন করা। অদম্য সাহসী শারমিনের পথ অনুসরণ করে দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের অসংখ্য অপ্রাপ্তবয়স্ক মেয়ে নিজেদের বাল্য বিয়ে ঠেকিয়ে নিজে মুক্তি পেয়ে সমাজকে বাল্য বিয়েসহ নানা কুসংস্কারের হাত থেকে রক্ষায় রাখছে অসাধারণ অবদান।

নারীদের এ সাফল্যের পথ ধরেই এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ। বিশ্বকে জানিয়ে দেবে নারীদের এগিয়ে যাওয়ার সাফল্যগাথা। নারীদের এগিয়ে যাওয়ার ক্ষেত্রে প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে জনপ্রতিনিধি, প্রশাসনও সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। নারীদের সাফল্যের এই ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকবে এই প্রত্যাশা সকলের।

#

২৫.০৪.২০১৮ পিআইডি প্রবন্ধ

ইন্টারনেটের ব্যবহারে প্রয়োজন সচেতনতা

ফারিহা হোসেন

যুগের পরিবর্তনের সাথে তথ্য প্রযুক্তির পরিবর্তন ঘটেছে। এই যুগে এর সুফল যেমন আছে, কুফলও আছে। তাই এ নিয়ে প্রাসঙ্গিকভাবে বলা দরকার, শৈশব শব্দটি শুনলে মনের মাঝে ভালোলাগার অনুভূতি ভেসে ওঠে। শিশুরা আমাদের খুব কাছের, আদরের এবং আমাদের ভবিষ্যৎ। ইন্টারনেটের অপব্যবহারের আগ্রাসী থাবায় বিপর্যস্ত শিশু-কিশোর, যুবক-যুবতীসহ নানা বয়সি মানুষ আজ হুমকির মুখে। বিশেষ করে ধর্ষণ, নির্যাতন এবং যৌন হয়রানির মতো উদ্বেগজনক ঘটনা প্রতিনিয়ত সংবাদ শিরোনাম হচ্ছে। তথ্য প্রযুক্তির এই যুগে যেমন প্রযুক্তি ছাড়া জীবনকে গতি দেওয়া যায় না, তেমনি এর নিরাপদ ব্যবহার সম্পর্কে অবগত হওয়া খুবই জরুরি। তথ্য-প্রযুক্তির সাথে তাল মিলিয়ে শিশুদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

ইন্টারনেট মানব সভ্যতার একটি বিস্ময়কর অবদান। ইন্টারনেটের মাধ্যমে আমাদের শিশুরা অবাধ তথ্যের সম্ভারে বিচরণের মধ্যদিয়ে নিজের চিন্তা-জ্ঞানের পরিধি, সৃজনশীলতার বিকাশ ঘটাতে পারছে। সেই সঙ্গে ইন্টারনেটের নিরাপদ ব্যবহারটিও তাদের জানা জরুরি। এ বিষয়ে অসচেতনতার কারণে তাদেরকে হুমকির মুখে পড়তে হচ্ছে। ইন্টারনেট এখন সামাজিক যোগাযোগ ব্যবস্থাকে হাতের মুঠোয় এনে দিয়েছে। এই সামাজিক যোগাযোগ ব্যবস্থার মাধ্যমে আমরা বন্ধুত্ব করছি নতুন নতুন মানুষের সাথে। আমাদের শিশুরাও এই বিভিন্ন ধরনের সামাজিক যোগাযোগ ব্যবস্থা যেমন ফেসবুক, টুইটার, হোয়াটসঅ্যাপ, ভাইবার, ইমো, ইন্সটাগ্রাম ইত্যাদিতে আকৃষ্ট হয়ে পড়ছে। তাদের সাথে বন্ধুত্ব হচ্ছে নতুন নতুন মানুষের। কেউ তাদের খুব কাছের মানুষও হয়ে উঠছে।

ইন্টারনেটের ব্যবহারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে সাইবার অপরাধের ঝুঁকি। বেসরকারি এক গবেষণায় দেখা গেছে, দেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের ৬০ ভাগই প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সাইবার অপরাধের শিকার। ছদ্মবেশে বখাটেপনা, উত্যক্ত করা থেকে শুরু করে সামাজিক মাধ্যমে হচ্ছে হ্যাকিং, ঘটছে ব্ল্যাকমেইলের মতো ঘটনাও। এর মাধ্যমে দেশে ক্রমেই বাড়ছে সাইবার অপরাধ। বেসরকারি হিসাবে, প্রতি ২০ সেকেন্ডে এ ধরনের একটি অপরাধ হচ্ছে। যার ক্ষতিকর প্রভাব ব্যক্তি থেকে শুরু করে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের ওপর পড়ছে।

সাইবার আক্রমণ হচ্ছে সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানগুলোতেও। এমনকি নিরাপত্তা বাহিনীর ওয়েবসাইটগুলোও এ হামলা থেকে রেহাই পাচ্ছে না। তথ্য চুরির পাশাপাশি দেশের ব্যাংকিং ও অনলাইনভিত্তিক প্রতিষ্ঠানে ঘটছে ডিজিটাল জালিয়াতি। ব্যাংক একাউন্ট হ্যাকিং করে হাতিয়ে নিচ্ছে বিপুল পরিমাণ অর্থ। এ অবস্থাকে সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য 'অশনি সংকেত' হিসেবে দেখছেন সমাজ বিজ্ঞানীরা।

জাতিসংঘের শিশুবিষয়ক সংস্থা (ইউনিসেফ) বলছে, দেশের ১৩ শতাংশ শিশু-কিশোর সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে হয়রানি বা উত্যক্তের শিকার হয়েছে। আর একাধিকবার হয়রানির শিকার হয়েছে ৩ দশমিক ৬ শতাংশ শিক্ষার্থী। হয়রানি বা উত্যক্তের কারণে ৩ দশমিক ৩ শতাংশ শিক্ষার্থী তাদের সোশ্যাল মিডিয়ার অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দিয়েছে। শিশুদের জন্য ইন্টারনেট নিরাপদ করতে বছরব্যাপী গণসচেতনতা কর্মসূচির উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এ জরিপ প্রকাশিত হয়েছে। সম্প্রতি রাজধানীতে এক অনুষ্ঠানে এ তথ্য তুলে ধরা হয়।

সারাদেশে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর একটি বড়ো অংশের বয়স ১৮ বছরের নিচে। ইন্টারনেটে নিরাপত্তা নিয়ে শিশুরা কী ভাবে, তাদের পরিস্থিতি কী এসব জানতে ইউনিসেফ সারাদেশে এই জরিপ চালায়। ১৩ থেকে ১৮ বছর বয়সি ১১ হাজার ৮২১ ছেলেমেয়ে এই জরিপে অংশ নেয়। ইউনিসেফ বাংলাদেশের ওই জরিপে বলা হয়, জরিপে ৮১ দশমিক ২ শতাংশ শিশু-কিশোর প্রতিদিন সোশ্যাল মিডিয়াতে সময় কাটায়। এদের ৯০ শতাংশই মুঠোফোনে ইন্টারনেট ব্যবহার করে। ৮০ দশমিক ১ শতাংশ শিশু-কিশোর কোনো ধরনের হয়রানির বা উত্যক্তের শিকার হয়নি।

জরিপের অংশ নেওয়া শিশু-কিশোরদের ৫২ দশমিক ৩ শতাংশ জানায়, কোনো অপরিচিত লোক তাদের অনলাইনে বন্ধু হতে চাইলে তারা বন্ধু হবে। তবে ৩৩ দশমিক ৯ শতাংশ শিশু-কিশোর বন্ধু হবে না বলে জানায়। তুমি কী কারণে ইন্টারনেট ব্যবহার করো এমন প্রশ্ন করা হয় জরিপকালে। এর উত্তরে ৬৭ দশমিক ৪ শতাংশ শিশু-কিশোর জানায়, তারা শেখার জন্য ইন্টারনেট ব্যবহার করে। আর ২১ দশমিক ৪ শতাংশ বন্ধু বানানোর জন্য ইন্টারনেট ব্যবহার করে। শিশুরা ট্যাব ব্যবহার করবে, ইন্টারনেট ব্যবহার করবে এতে অসুবিধাতো নেই। তবে ওরা ইন্টারনেট নিরাপদভাবে ব্যবহার করবে, জ্ঞানের ভাণ্ডার হিসেবে ব্যবহার করবে এটাই প্রত্যাশিত। এ জন্য ঝুঁকির মধ্যে যাতে কেউ না পড়ে সে বিষয় তাদের সচেতন করার দায়িত্ব সকলের।

এ অবস্থায় শঙ্কা প্রকাশ করে বিশ্লেষকরা বলছেন, এখনই সাইবার অপরাধের লাগাম টানা না গেলে হুমকির মুখে পড়বে শিশু-কিশোর-তরুণ, নারী-পুরুষ, সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা। কারণ, সামনের দিনগুলোতে অপরাধের সবচেয়ে বড়ো জগত হতে চলেছে সাইবার জগত। বিশেষ করে বাংলাদেশের মতো দেশ- যেখানে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের বেশির ভাগই অসচেতন, সেখানে সাইবার অপরাধ ক্ষতির বড়ো কারণ হতে পারে বলে মনে করছেন অপরাধ বিজ্ঞানীরা।

ইউনিসেফ এর স্থানীয় প্রতিনিধি এডুওয়ার্ড বেগবেদার বলেন, ডিজিটাল প্রযুক্তি ইতোমধ্যেই পৃথিবীটা পরিবর্তন করে ফেলেছে। কম বয়সিরা বেশি ইন্টারনেট ব্যবহার করছে। শিশুরা ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহার করছে তথ্য খুঁজতে। তবে শিশুদের হয়রানির শিকার হওয়ার আশঙ্কা রয়েছে খুব বেশি। দুষ্কৃতকারীরা খুব সহজেই শিশুদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারে পরিচয় লুকিয়ে। এটা কমাতে গবেষণা ও সচেতনতা প্রয়োজন। ইন্টারনেটের অপব্যবহার রোধ করতে হলে আগাম সতর্ক হতে হবে পরিবার এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে। এ ধরনের সাইবার জগতের আগ্রাসী ঘটনাকে সামাজিকভাবে প্রতিরোধ করা দরকার।

সরকারকে নিরাপদ ইন্টারনেটের ব্যবহারবিধি পাঠ্যপুস্তকে সংযুক্ত করতে হবে এবং বিদ্যমান আইনের কঠোর প্রয়োগ করতে হবে। এভাবেই আমাদের ফিরিয়ে দিতে হবে শিশুর নিরাপদ শৈশব। কারণ তথ্য-প্রযুক্তির প্রয়োগ তথা ইন্টারনেটের মাধ্যমে শিশুর যৌন নির্যাতনকে এখন আর হালকাভাবে নেয়ার সুযোগ নেই। শিশুর হাতে ডিভাইস তুলে দেওয়ার সাথে সাথে তাকে শিখিয়ে দিতে হবে এর নিরাপদ ব্যবহার। তাকে জানিয়ে দিতে হবে এর ক্ষতিকর দিক। তাকে পরিচয় করিয়ে দিতে হবে শিক্ষামূলক ওয়েবসাইটের সাথে। ডিভাইসে রাখতে হবে প্যারেন্টাল গাইডেন্স।

ইন্টারনেটের কল্যাণে আজ আমাদের সবার সামনে অসীম তথ্যভাণ্ডার এবং বিনোদনের সীমাহীন দ্বার উন্মোচিত হয়েছে। এই দুনিয়ার বাইরে নয় আমাদের শিশুরা। এটা সত্য, শিশুর মানসিক বিকাশের জন্য, নব নব প্রযুক্তির গুরুত্বপূর্ণ অবদান রয়েছে। তবে সামান্য অসচেতন হলেই ইন্টারনেট ব্যবহারের ক্ষতিকর দিকগুলোতে আসক্ত হতে পারে শিশুরা। এজন্য শিশুদের ইন্টারনেট দুনিয়া থেকে সরিয়ে না দিয়ে সময়োপযোগী কিছু পদক্ষেপ নিতে হবে। শিশুর সাথে গড়ে তুলতে হবে বন্ধুত্বমূলক সম্পর্ক। শিশুটি যেন তার সবকথা মা-বাবার সাথে-ভাই-বোনের সাথে শেয়ার করতে পারে সেই সুযোগ থাকা জরুরি। তবেই আমরা গড়ে তুলতে পারব শিশুর নিরাপদ ভবিষ্যৎ।

#

০৩.০৫.২০১৮ পিআইডি প্রবন্ধ

শিশুশ্রম নিরসনে প্রয়োজন মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি

জিনাত আরা আহমেদ

একটি শিশু মাতা-পিতাসহ একটি জাতির আশা, আকাঙ্ক্ষা, প্রত্যাশা ও স্বপ্নের অপর নাম। সাধারণভাবে জন্ম থেকে আঠারো বছরের কম বয়সি মানুষের পরিচয় হলো শিশু। সে আগামী দিনের একজন প্রত্যাশিত কর্মক্ষম মানবসম্পদ, সঠিক পরিচর্যায় যার বেড়ে ওঠার কথা মানুষের প্রাপ্য সকল মৌলিক অধিকার আর মর্যাদা নিয়ে। কিন্তু আর্থসামাজিক টানাপোড়েন আর জীবনের বাস্তবতায় অনেক শিশুকে শৈশব আর কৈশোরের সব চাওয়া-পাওয়া, আনন্দকে বিসর্জন দিয়ে বহন করতে হয় পরিবারের দায়িত্ব, নিয়োজিত হতে হয় ঝুঁকিপূর্ণ কাজে।

শিশুশ্রম শিশুর উন্নয়নকে বাধাগ্রস্ত করে, শিশুর শৈশব কেড়ে নেয়, শিশুকে তার শিক্ষার অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। নানা ধরনের স্বাস্থ্যগত সমস্যা সৃষ্টি হওয়া ছাড়াও সেই সমস্যাকে জটিল করে তোলে। আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা আইএলও শিশুশ্রম বলতে বুঝিয়েছে এমন শ্রম যা শিশুকে শৈশব থেকে বঞ্চিত করে তাদের সকল সম্ভাবনা ও মর্যাদা নষ্ট করে অর্থাৎ সেই শ্রম তাদের শারীরিক ও মানসিক বৃদ্ধিকে ক্ষতিগ্রস্ত করে।

দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশের মতো বাংলাদেশও শিশুশ্রমের রাহুমুক্ত নয়। যে বয়সে একটা শিশুর বই, খাতা, পেন্সিল নিয়ে স্কুলে আসা-যাওয়া, আনন্দিত চিত্তে সহপাঠীদের সাথে খেলা করার কথা, সেই বয়সেই শিশুকে নেমে পড়তে হয় জীবিকার সন্ধানে। অর্থনৈতিক দুরবস্থার কারণে অনেক মাতাপিতা ছেলেমেয়ের লেখাপড়ার বিষয়ে গুরুত্ব দেয় না। স্বল্পশিক্ষিত মাতাপিতা দারিদ্র্যের কষাঘাতে যখন পরিবারের ভরণপোষণে ব্যর্থ হন তখন তারা সন্তানকে স্কুলে পাঠানো এবং লেখাপড়ার খরচ জোগাতে উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। তারা মনে করেন স্কুলে থাকার সময়টুকুতে সে যদি কাজে নিয়োজিত থাকে তাহলে সংসারের আয় সংকুলানে সহায়ক হয়।

আবার নদীভাঙন, বন্যা, খরা, জলোচ্ছ্বাস- এসব প্রাকৃতিক দুর্যোগে অনেক শিশু মাতাপিতার সাথে ছিন্নমূল মানুষ হিসেবে শহরে আসে কাজের সন্ধানে। এমন বাস্তবতায় কিছু মুনাফালোভী লোক স্বল্প মজুরির বিনিময়ে শিশুদের কাজে লাগায়। আবার সুযোগ পেয়ে অধিক সময় কাজে নিয়োজিত রাখে। প্রধানত দুটি সেক্টরে বাংলাদেশে শিশুশ্রম বিরাজমান। আনুষ্ঠানিক সেক্টর, যেমন শিল্পকারখানা, বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান, যোগাযোগ ও পরিবহণ ব্যবস্থা, জাহাজভাঙা ইত্যাদি এবং অনানুষ্ঠানিক সেক্টর যেমন- কৃষি, পশুপালন, মৎস্যশিকার/ মৎস্যচাষ, গৃহকর্ম, নির্মাণকর্ম, ইটভাঙা, রিকসা-ভ্যান চালানো, দিন মজুরি ইত্যাদি। কিন্তু সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও শিশুদের ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম নিষিদ্ধ। শুধু তাই নয় শিশুকে শ্রমে নিয়োজিত করার ক্ষেত্রেও শর্ত আরোপ করা হয়েছে জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতিমালা ২০১০ এ। এতে ১৮ বছরের নীচে শিশুকে কোনো ধরনের ঝুঁকিপূর্ণ কাজে নিয়োগ দেওয়া আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ।

পৃথিবীর প্রায় সব দেশের মতো বাংলাদেশে শিশুশ্রম নিষিদ্ধ হলেও বাস্তবিক অর্থে অল্প মজুরি দিয়ে অধিক কর্মঘণ্টায় নিয়োজিত রাখা যায় বলে তাদের কাজে নিয়োগ দিতে মালিকপক্ষের আগ্রহ বেশি থাকে। অনেক সময় কোনো মজুরি ছাড়াই পেটেভাতে কিংবা সামান্য মজুরিতে শিশুদের কাজে রাখা হয় ।

বাংলাদেশ সংবিধানে সকল নাগরিকের মৌলিক অধিকারের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে এবং জবরদস্তিমূলক শ্রম পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ঝুঁকিপূর্ণ ধরনের শ্রমসহ সবধরনের শ্রমসাধ্য কাজ থেকে শিশুদের প্রত্যাহার করে তাদের জীবনকে অর্থবহ করে তোলাই জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতিমালার লক্ষ্য। এ নীতিমালায় শিশু বিকাশের স্বার্থকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। যদি কোনো শিশু দৈনিক সর্বোচ্চ পাঁচঘণ্টার অতিরিক্ত সময় কাজ করে; নিরাপত্তাহীন ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ করে; সাধ্যের অতিরিক্ত দায়িত্ব পালন করে; বিশ্রাম বা বিনোদনের কোনো সুযোগ না পায়; যা তার শিক্ষাজীবন ব্যাহত করে এবং এমন কোনো কাজে নিয়োজিত হয় যা জীবনের জন্য ঝুঁকিপূর্ণ ও অমর্যাদাকর তবে মালিক বা নিয়োগকর্তা শিশু অথবা তার অভিভাবকের সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হবে। চুক্তি অনুযায়ী ১৪ বছরের কম বয়সি শিশুকে সার্বক্ষণিক কর্মী হিসেবে নিয়োগ করা যাবে না। কাজের সম্পূর্ণ শর্ত থাকতে হবে, যাতে দৈনিক কর্মঘণ্টা, কর্মতালিকা, নির্দিষ্ট হারে নিয়মিত বেতনসহ সপ্তাহে কমপক্ষে একদিন ছুটির উল্লেখ থাকবে। লেখাপড়া অথবা দক্ষতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণের সুযোগ এবং চাকরিচ্যুতির কমপক্ষে একমাস পূর্বে অবহিত করতে হবে। শিশুরা সহজেই কারিগরি বিষয় রপ্ত করতে পারে, এজন্য শ্রমে নিয়োজিত শিশুদের প্রচলিত আইনের আলোকে প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করার বিষয়েও গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এ নীতিমালায়। যাতে আগামী দিনে তারা প্রতিযোগিতামূলক পরিবেশে নিজেদের দক্ষ মানবসম্পদ হিসেবে গড়ে তুলতে পারে।

স্বাধীনতার পর মহান মুক্তিযুদ্ধের চেতনা নিয়ে প্রবর্তন করা হয় শিশু আইন ১৯৭৪। পরবর্তীতে জাতীয় শিশুনীতি-১৯৯৪ প্রণয়ন করা হয়। শিশুদের জন্য জাতীয় কর্মপরিকল্পনা ২০০৫-২০১০ গ্রহণ করাসহ জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ অনুসমর্থনে বাংলাদেশিদের দায়িত্বশীল ভূমিকা এবং তৈরি পোশাক শিল্প থেকে শিশুশ্রম প্রত্যাহারে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হয়েছে। তারপরও শিশুশ্রম নিরসন তথা ঝুঁকিপূর্ণ শ্রম থেকে শিশুদের পুরোপুরি প্রত্যাহার এখনো সম্ভব হয়নি। সরকার ২০২১ সালের মধ্যে সম্ভাব্য ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম বন্ধ করার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছে। চলতি বছর বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর (BBS) প্রাক্কলিত শিশুশ্রম জরিপ থেকে দেখা গেছে, দেশে ১৭ লক্ষ শিশু শ্রমিক ঝুঁকিপূর্ণ কাজ করছে। ৫ থেকে ১৭ বছর বয়সি এ শিশুরা পূর্ণকালীন শ্রমিক হিসেবে কাজ করছে। সবমিলিয়ে দেশে ৩৪ লক্ষ ৫০ হাজার শিশু কোনো-না-কোনোভাবে শ্রমের সাথে যুক্ত রয়েছে।

বাংলাদেশের সামগ্রিক আর্থসামাজিক উন্নয়ন কৌশল আজ তৃতীয় বিশ্বের বহু দেশের জন্য একটি মডেল। আজকে যে শিশু বা কিশোর, আগামী দিনে সেই হবে এ উন্নয়ন কৌশলের মূল চালিকাশক্তি। এই শিশু কিশোরদের আধুনিক সমাজের উপযোগী করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে শিশুশ্রম এক বিরাট প্রতিবন্ধকতা। একটি স্বাধীন দেশের মানুষ হিসেবে প্রত্যেক ব্যক্তির রয়েছে মানবিকভাবে বেঁচে থাকার অধিকার। সুষম সমাজ গড়ে তুলতে শিশুর মানবাধিকার নিশ্চিত করতে হবে সর্বাগ্রে। তাই শ্রমসাধ্য কাজ থেকে শিশুদের প্রত্যাহার করে তার সার্বিক বিকাশ নিশ্চিতকরণে আমাদের থাকতে হবে মানবিক চেতনাবোধ এবং ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি।

#

৩০.০৪.২০১৮ পিআইডি প্রবন্ধ

বাংলাদেশি খেলনার বিশ্বজয়

মো. ইলিয়াছ হোসেন

জাপানের একটি প্রখ্যাত খেলনা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠান হাসিমোতো গ্রুপ। এ গ্রুপের উদ্যোগে কুমিল্লা ইপিজেডে ২০১৪ সালে হাসি টাইগার লিমিটেড নামে একটি কারখানা নির্মাণ করা হয়। ইপিজেডে নির্মিত শতভাগ রপ্তানিমুখী খেলনা উৎপাদনের এমন কারখানা বাংলাদেশে এটাই প্রথম। কুমিল্লা ইপিজেডের ২১১ নম্বর প্লটে প্রায় দেড় বিঘা জমির ওপর তৈরি এ কারখানায় ৩০০ শ্রমিকসহ ৩৫০ জন কাজ করেন। এর মধ্যে দুই শতাধিক কর্মী নারী। প্রশিক্ষণের জন্য ছয়জন চীনা প্রশিক্ষকও রয়েছেন।

মূলত জাপানের বাজার চাহিদার কথা মাথায় রেখে এই কারখানায় খেলনা তৈরি হয়। এছাড়া নামিদামি ব্র্যান্ড ও প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী খেলনাও তৈরি করে এ কারখানা। হাসি ব্র্যান্ডের ওফুরো সিরিজের একশ্রেণির খেলনা আছে যেগুলো পানিতে ভাসে ও নানা রঙের আলোর বিচ্ছুরণ ঘটায়। জাপানে বাথটাবে গোসল করার সংস্কৃতি জনপ্রিয় হওয়ায় ওফুরো সিরিজের খেলনাগুলোর প্রচলন বেশি। এসব খেলনার মধ্যে আছে রংবেরঙের হাঁস, ব্যাঙ, কচ্ছপ প্রভৃতি।

উন্নত দেশগুলোতে এখন বাংলাদেশি খেলনার ব্যাপক চাহিদা। প্রতি বছরই বাংলাদেশি খেলনার রপ্তানি বাড়ছে। গত কয়েক বছরে বাংলাদেশের খেলনা রপ্তানির চিত্রটি বেশ আশাবাদী হওয়ার মতো। ২০১২-১৩ অর্থবছরে বাংলাদেশ থেকে যেখানে মাত্র ৭ হাজার ৬৩৭ মার্কিন ডলারের খেলনা রপ্তানি হয়েছে সেখানে ২০১৫-১৬ অর্থবছরে খেলনা রপ্তানির পরিমাণ ছিল ৭০ লাখ ৩৫ হাজার মার্কিন ডলার।

বাংলাদেশ থেকে খেলনা রপ্তানির তালিকায় আছে ট্রাইসাইকেল, ইলেকট্রিক বা ব্যাটারিচালিত খেলনা গাড়ি, প্যাডেলচালিত গাড়ি, ইলেকট্রিক পুতুল, সাধারণ পুতুল ইত্যাদি। বাংলাদেশ থেকে যত খেলনা রপ্তানি হয়, এর মধ্যে প্রায় ৯০ শতাংশের বেশি ট্রাইসাইকেল, স্কুটার, প্যাডেল কার, পুতুল ইত্যাদি। এসব খেলনার দামও তুলনামূলক বেশি।

বাংলাদেশ রপ্তানি প্রক্রিয়াকরণ এলাকা কর্তৃপক্ষ (বেপজা) সূত্রে জানা গেছে, সারাদেশের বিভিন্ন ইপিজেডে দুটি খেলনা কারখানা আছে। হাসি টাইগার এর একটি। এছাড়া নীলফামারীর উত্তরা ইপিজেডে সনিক লিমিটেড নামে আরেকটি খেলনা কারখানা আছে।

ইপিজেডের বাইরেও কয়েকটি কারখানা আছে। চট্টগ্রামের আনোয়ারায় গোল্ডেন সন নামের একটি দেশি প্রতিষ্ঠান শিশুদের জন্য খেলার সামগ্রী তৈরি করে অস্ট্রেলিয়ায় রফতানি করে থাকে। এছাড়া গাজীপুরে 'বে গ্রুপ' এর অর্থনৈতিক অঞ্চলে চীনের খেলনা উৎপাদক প্রতিষ্ঠান মাল্টিটেক ইন্টারন্যাশনালের একটি কারখানা করেছে। এ কারখানা ইতোমধ্যে উৎপাদন শুরু করেছে, খুব শীঘ্রই রফতানি শুরু হবে। বে অর্থনৈতিক অঞ্চলের কর্মকর্তারা জানান, মাল্টিটেক ইন্টারন্যাশনাল যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশের ব্র্যান্ডের জন্য খেলনা তৈরি করে। বাংলাদেশের কারখানাটি বিশিষ্ট ব্যক্তি ও তারকাদের প্রতিকৃতির খেলনা তৈরি করবে।

২০১৫-১৬ অর্থবছরে যে খেলনা রপ্তানি হয়েছে এর অর্ধেকই হয়েছে তিনটি দেশে। বাংলাদেশি খেলনা আমদানিতে শীর্ষস্থানে আছে ফ্রান্স। দেশটি ওই বছর বাংলাদেশ থেকে ১৬ লক্ষ ডলারের খেলনা আমদানি করেছে। এরপরের স্থানে থাকা স্পেন নিয়েছে ১১ লক্ষ ৬৩ হাজার ডলারের খেলনা। আর জাপানে রফতানি হয়েছে ৯ লক্ষ ২৯ হাজার ডলারের খেলনা। বাংলাদেশ থেকে খেলনা আমদানির তালিকায় আরও রয়েছে যুক্তরাজ্য, ইতালি, মেক্সিকো, নেদারল্যান্ডস, তাইওয়ান, যুক্তরাষ্ট্র, অস্ট্রেলিয়া ও ব্রাজিল। মাত্র পাঁচ বছর আগেও এই তালিকা ছিল খুবই ছোট ।

বাংলাদেশের খেলনার রপ্তানিবাজার মূলত ইউরোপ ও জাপান কেন্দ্রিক। খেলনা রপ্তানিতে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোতে কর সুবিধা পাওয়া যায়। যেমন ট্রাইসাইকেল, স্কুটার, প্যাডেল কার ও পুতুলের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় ইউনিয়নের দেশগুলোতে আমদানি শুল্ক নেই। প্লাস্টিক ও ইলেকট্রনিক খেলনার ওপর ৪ দশমিক ৭ শতাংশ আমদানি শুল্ক আছে। আর জাপানের বাজারে শুল্ক নেই।

বাংলাদেশ থেকে খেলনার মতো একটি পণ্য বিশ্বের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি খুবই ইতিবাচক একটি বিষয়। খেলনার একটি বড় বিশ্ববাজার রয়েছে, যার অধিকাংশ চীনের দখলে। এই বাজার ধরতে বাংলাদেশি শ্রমিকদের প্রতিযোগিতা সক্ষমতা বাড়ানো পাশাপাশি তাদের পরিচালনায় মধ্যম পর্যায়ের কর্মকর্তাদের দক্ষতা উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। এ জন্য বাজার চাহিদা অনুযায়ী শিক্ষা কার্যক্রম তৈরি, প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে।

খেলনা রপ্তানিকারক প্রতিষ্ঠানগুলোর মতে, খেলনা তৈরি একটি শ্রমঘন শিল্প। তৈরি পোশাকের মতো তাই এ শিল্পেও প্রচুর কর্মসংস্থানের সুযোগ রয়েছে। আর খেলনার বিশ্ব বাজারের আকারও বিশাল। বাংলাদেশ খুব ছোট পরিসরে এ বাজারে প্রবেশ করেছে। মূলত, মজুরি বেড়ে যাওয়ায় চীনে খেলনা তৈরির খরচও এখন বেড়ে গেছে। এ কারণে বিদেশি খেলনা উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানগুলো বাংলাদেশে কারখানা গড়তে আগ্রহী হয়ে উঠছে। এ পরিপ্রেক্ষিতেই বাংলাদেশে গত তিন বছরে তিনটি কারখানা গড়ে উঠেছে। আরও কয়েকটি কোম্পানি বাংলাদেশি উদ্যোক্তাদের সঙ্গে যোগাযোগ করছে বলে জানা গেছে।

পরিশেষে বলা যায়, বাংলাদেশের তৈরি খেলনা এখন জনপ্রিয় আন্তর্জাতিক ব্র্যান্ড হিসেবে পশ্চিমা শিশু ও অভিভাবকদের মন জয় করছে। 'পেবেল' নামে বাংলাদেশি নারীদের হাতে বোনা পরিবেশবান্ধব খেলনার গুণগতমান ভালো হওয়ায় এরই মধ্যে ওয়ার্ল্ড ফেয়ার ট্রেড অর্গানাইজেশন সনদ (ডব্লিউএফটিও) পেয়েছে। পেবেল এখন পর্যন্ত বিশ্বে ডব্লিউএফটিও-সনদপ্রাপ্ত একমাত্র হাতে তৈরি খেলনার ব্র্যান্ড। তাই খেলনা তৈরি বাংলাদেশি উদ্যোক্তাদের জন্য একটি লাভজনক বিনিয়োগ হতে পারে।

#

১৫.০৪.২০১৮ পিআইডি প্রবন্ধ

সড়ক অবকাঠামো উন্নয়নে চলছে নীরব বিপ্লব

মো. আবু নাছের

স্বপ্ন দেখছে বাংলাদেশ। ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হওয়ার এ স্বপ্নে বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে ভালোভাবেই। লক্ষ্যে পৌঁছাতে সঠিক পরিকল্পনা ও দূরদর্শিতার সাথে পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়ন ও মানসম্মত যোগাযোগ অবকাঠামো গড়ে তুলতে হবে। ২০২০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৮ শতাংশে নিতে হলে বিনিয়োগ ও সঞ্চয় বাড়ানোর সঙ্গে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিতে হবে অবকাঠামো উন্নয়নে। যোগাযোগ ব্যবস্থা, বিশেষ করে সড়ক ও রেল যোগাযোগ উন্নত হলে বিনিয়োগ এমনিতেই বেড়ে যাবে। আর বিশ্বের সঙ্গে তাল মেলাতে বাংলাদেশের যোগাযোগ অবকাঠামো উন্নয়নে শুরু হয়েছে নীরব বিপ্লব। বলা যায়, আধুনিক পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার সূচনা হতে যাচ্ছে বাংলাদেশে।

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক দেশের অর্থনীতির লাইফলাইন বলে খ্যাত। বন্দরনগরী চট্টগ্রামকে সংযুক্ত করেছে এ মহাসড়ক। এ পথেই আনা নেয়া হয় দেশের আমদানি ও রপ্তানি বাণিজ্যের সিংহভাগ পণ্য। মহাসড়কটির ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে সরকার এ মহাসড়কের একশত নব্বই কিলোমিটার ইতোমধ্যে চারলেনে উন্নীত করেছে। কিন্তু মহাসড়কের ফেনীর মহিপাল অংশে প্রায়শ দীর্ঘ যানজট লেগেই থাকতো। এ যানজট থেকে মুক্ত হতে নির্মাণ করা হয়েছে ছয়লেন বিশিষ্ট ফ্লাইওভার।

মহিপাল ফ্লাইওভার নির্মাণের পর থেকেই বদলে গেছে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের ফেনী ইন্টারসেকশনের যানজটচিত্র। ঘন্টার পর ঘন্টা এখন আর যানবাহনকে অপেক্ষা করতে হচ্ছে না মহিপাল মোড় পার হতে। এটি মহাসড়কে নির্মিত দেশের প্রথম ছয়লেন বিশিষ্ট ফ্লাইওভার। ছয়লেনের পাশাপাশি নিচে রয়েছে চারলেনের মহাসড়ক এবং পাশে ধীরগতির যানবাহনের জন্য সার্ভিস লেন।

প্রায় একশত বিরাশি কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত মহিপাল ফ্লাইওভারটির মূল অংশের দৈর্ঘ্য ছয়শ ষাট মিটার এবং প্রস্থ প্রায় পঁচিশ মিটার। প্রায় এক হাজার তিনশত সত্তর মিটার দীর্ঘ সার্ভিস রোড ছাড়াও প্রায় এক হাজার একশত ষাট মিটার দীর্ঘ এপ্রোচ সড়ক নির্মিত হয়েছে। মূল বিশ্বরোড থেকে একটি সড়ক ফ্লাইওভারের অপর পাশ দিয়ে ফেনী শহর ও ফেনী-নোয়াখালী সড়ককে সংযুক্ত করেছে।

এর আগে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়ক চারলেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পের আওতায় প্রায় একশত নব্বই কিলোমিটার মহাসড়কে তেইশটি সেতু, দুইশত বিয়াল্লিশটি কালভার্ট, তিনটি রেলওয়ে ওভারপাস, চৌদ্দটি সড়ক বাইপাস, দুইটি আন্ডারপাস, চৌত্রিশটি স্টীলফুট ওভারব্রীজ এবং একষট্টিটি বাস-বে নির্মাণ করা হয়েছে। চারলেনে উন্নীতকরণ প্রকল্পটি সমাপ্ত হওয়ায় ঢাকা-চট্টগ্রামের ভ্রমণ সময় অর্ধেকে নেমে এসেছে। দীর্ঘ সময়ের পরিবর্তে এখন মাত্র চারঘন্টায় ঢাকা-চট্টগ্রাম যাতায়াত সম্ভব হচ্ছে। এতে যানজট লাঘবের পাশাপাশি দুর্ঘটনা ন্যূনতম পর্যায়ে নেমে এসেছে। স্বল্প সময়ে যাত্রী পরিবহণের পাশাপাশি আমদানি-রপ্তানি পণ্য পরিবহণ সহজতর ও সাশ্রয়ী হয়েছে।

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের যাত্রাবাড়ি থেকে কাঁচপুর অংশ ইতোমধ্যে আটলেনে উন্নীত হয়েছে। দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড গতিশীল হওয়ায় এ সড়কের ওপর যানবাহন এবং পণ্যবাহী পরিবহণের চাপ ক্রমশ: বাড়ছে। এ মহাসড়কে বিদ্যমান কাঁচপুর, মেঘনা ও গোমতি সেতু তিনটি বাড়তি যানবাহনের চাপ মোকাবিলা করতে পারছেনা। এ বাস্তবতায় সরকার জাইকা'র অর্থায়নে বিদ্যমান ৩টি সেতুর পাশে আরো নতুন ৩টি সেতুর নির্মাণ কাজ শুরু করেছে। ক্রমবর্ধমান অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বিবেচনায় নিয়ে সরকার সদ্যসমাপ্ত চারলেন মহাসড়কের পাশাপাশি ঢাকা-চট্টগ্রাম এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণের প্রস্তুতিমূলক কাজও ইতোমধ্যে শুরু করেছে।

ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের পাশাপাশি ঢাকা-ময়মনসিংহ মহাসড়কও একটি গুরুত্বপূর্ণ জাতীয় মহাসড়ক। বৃহত্তর ময়মসসিংহ অঞ্চলের উৎপাদিত কৃষি ও শিল্পপণ্য এ পথেই ঢাকাসহ সারাদেশে পরিবহণ করা হয়। এ মহাসড়কটির জয়দেবপুর থেকে ময়মনসিংহ অংশ চারলেনে উন্নীত করা হয়েছে। এর আগে এ মহাসড়কের মাওনায় নির্মাণ করা হয়েছে ফ্লাইওভার। বৃহত্তর ময়মসসিংহ অঞ্চলের মানুষ এখন স্বল্পসময়ে যানজটমুক্ত মহাসড়কে ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে চলাচল করছে। কমে এসেছে সড়ক দুর্ঘটনা। জয়দেবপুর থেকে এলেঙ্গা পর্যন্ত অংশ চারলেনে উন্নীতকরণ কাজ এগিয়ে চলেছে। এছাড়া সরকার পর্যায়ক্রমে দেশের সকল জাতীয় মহাসড়ক চারলেনে উন্নীত করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ১ হাজার ৭ শত বায়ান্ন কিলোমিটার মহাসড়ক চারলেনে উন্নীত করার লক্ষ্যে এশিয় উন্নয়ন ব্যাংকের অর্থায়নে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের কাজ শেষ হয়েছে।

এছাড়াও সড়ক পরিবহণ ও সেতু মন্ত্রণালয়ের চলমান মেগা প্রকল্পের মধ্যে রয়েছে স্বপ্নের পদ্মা সেতু নির্মাণ, বাংলাদেশের প্রথম মেট্রোরেল বা ম্যাস র‍্যাপিড ট্রানজিট ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, এয়ারপোর্ট থেকে জয়দেবপুর পর্যন্ত দ্রুতগতির বাস র‍্যাপিড ট্রানজিট, এয়ারপোর্ট থেকে ঢাকা-চট্টগ্রাম মহাসড়কের কুতুবখালি পর্যন্ত উড়ালসড়ক, কর্ণফুলি নদীর তলদেশ দিয়ে টানেল নির্মাণ, চার লেনবিশিষ্ট ২য় কাঁচপুর, ২য় মেঘনা ও ২য় গোমতী সেতু নির্মাণ, ঢাকা-খুলনা মহাসড়কের যাত্রাবাড়ি ইন্টারসেকশন থেকে মাওয়া পর্যন্ত এবং পাঁচ্চর-ভাংগা অংশ ধীরগতির যানবাহনের জন্য উভয় পাশে পৃথক লেনসহ চারলেনে উন্নীতকরণ, জয়দেবপুর-টাঙ্গাইল-এলেঙ্গা জাতীয় মহাসড়ক ধীরগতির যানবাহনের জন্য পৃথক লেনসহ চারলেনে উন্নীতকরণ, ওয়েস্টার্ণ বাংলাদেশ ব্রীজ ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট এর আওতায় ৬১টি সেতু নির্মাণ, ক্রস বর্ডার রোড নেটওয়ার্ক ইম্প্রুভমেন্ট প্রজেক্ট এর আওতায় কালনা সেতুসহ ১৭টি সেতু নির্মাণ ইত্যাদি।

বর্তমান বিশ্বায়ন ও বাজার অর্থনীতির প্রেক্ষাপটে আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক পরিবহণ ও নেটওয়ার্কের সাথে বাংলাদেশের যুক্ত থাকার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এ জন্য একটি উপযোগী, উন্নত এবং সুসমন্বিত পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থা গড়ে তুলতে সরকার নিরলসভাবে কাজ করছে। ধীরে ধীরে বাস্তব রূপ লাভ করছে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশের স্বপ্ন।

#

১৫.০৪.২০১৮ পিআইডি প্রবন্ধ

উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণঃ নতুন উচ্চতায় বাংলাদেশ

মোতাহার হোসেন

রাজধানীর অন্যতম ব্যস্ত এলাকা খিলগাঁওয়ের আমতলায় অফিস সময়ে একটি রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সামনের ফুটপাতে সারিবদ্ধভাবে বসে আছেন নানাবয়সী দরিদ্র, অস্বচ্ছল, পঙ্গু, বিধবা, বয়োবৃদ্ধ নারী ও পুরুষ। এটি প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহের অফিস সময়ের নিয়মিত চিত্র। এরকম একদিন ঐ রাস্তা পার হওয়ার সময় কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে কানপেতে শুনতে চাইলাম তারা কি জন্য বসে আছেন, কি চান তারা। উত্তর মেলে সহজেই। এরা সবাই দু:স্থ ভাতার উপকারভোগী। একজন অন্যজনকে বলছেন নিজের জীবনের কথা, এই ভাতা না পেলে তাকে না খেয়ে মরতে হতো, এই টাকা জমিয়ে রেখে তার মেয়েকে বিয়ে দিচ্ছেন- এমন নানান কথা।

একটি কল্যাণমূলক রাষ্ট্রের জন্য এ ধরনের কর্মসূচি অব্যাহত থাকা অপরিহার্য। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন সরকার ১৯৯৬ সালে ক্ষমতায় এসে এ ধরনের ভাতার প্রচলন করেন। তারই ধারাবাহিকতায় বর্তমানে আরও বিস্তৃত পরিসরে ভাতা দেওয়া অব্যাহত রয়েছে। একই সাথে মুক্তিযোদ্ধা, শহিদ মুক্তিযোদ্ধা পরিবারকে মাসিক সম্মানি ভাতা দেয়া হচ্ছে। দিন দিন এসব ভাতার উপকারভোগীর সংখ্যা এবং আর্থিক সহায়তার পরিমাণও বাড়ছে। এধরনের কর্মসূচি সম্ভব হয়েছে সরকারের সদিচ্ছা ও দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থা শক্তিশালী হওয়ায়।

ইতোমধ্যে বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের উন্নয়নশীল দেশের কাতারে সামিল হয়েছে। জাতি হিসাবে এটা আমাদের জন্য গর্বের। এই অর্জনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ বিশ্বে অনন্য মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হলো। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে মধ্যম আয়ের দেশে উন্নীত হতে যে তিনটি সূচক রয়েছে, সবসূচকেই বাংলাদেশ এগিয়ে আছে। মাথাপিছু আয়, মানব সম্পদের উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক - একাধারে তিনটি সূচকেই যোগ্যতা অর্জন নিঃসন্দেহে একটি বিরল ঘটনা।

২০০৮ সালে সরকার একটি প্রেক্ষিত পরিকল্পনা ২০১০-২১ প্রণয়ন করে। ঐ পরিকল্পনায় ২০২১ সাল নাগাদ বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশে পরিণত করার প্রত্যাশা ব্যক্ত করা হয়। এ পরিকল্পনা বাস্তবায়নে সুনির্দিষ্ট কার্যপদ্ধতি ও কঠোর পরিশ্রমের ফলে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বের হওয়া সম্ভব হয়েছে। স্বাধীনতা পরবর্তী উন্নয়ন ইতিহাসে বাংলাদেশের স্বল্পোন্নত (এলডিসি) থেকে উন্নয়নশীল দেশের পথে উত্তরণ পর্বটি জাতীয় জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হিসেবে দেখা হচ্ছে। এখন উন্নয়নশীল বিশ্বের রোল মডেল হচ্ছে বাংলাদেশ।

উন্নয়নশীল দেশের স্বীকৃতি পাওয়ায় বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের মর্যাদা ও অবস্থান আরও সুসংহত হবে। আন্তর্জাতিক ঋণবাজার থেকে ঋণ গ্রহণের ক্ষেত্রে একটি তুলনামূলক সুবিধাজনক অবস্থা তৈরি হবে। ঋণ দেওয়ার ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে এখন কম ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হিসেবে গণ্য করা হবে। এতে বিদেশি বিনিয়োগ বাড়বে, নতুন কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে। পাশাপাশি দেশের সামনে কিছু চ্যালেঞ্জও যুক্ত হতে পারে। বিশেষ করে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক উন্নয়ন সংস্থার ঋণ পাওয়ার ক্ষেত্রে শর্ত কঠিন হতে পারে, রপ্তানিতে শুল্ক ও কোটামুক্ত বাজার সুবিধা সংকুচিত হতে পারে।

প্রসঙ্গত: বিশ্বব্যাংক সম্প্রতি বাংলাদেশকে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ ঘোষণা করে তালিকা প্রকাশ করে। বিশ্বব্যাংক মধ্যম আয়ের দেশগুলোকে দুটি শ্রেণিতে ভাগ করেছে। একটি হচ্ছে নিম্ন মধ্যম আয়ের দেশ, অন্যটি উচ্চ মধ্যম আয়ের দেশ। প্রতিবছর ১ জুলাই বিশ্বব্যাংক আনুষ্ঠানিকভাবে মাথাপিছু মোট জাতীয় আয় অনুসারে দেশগুলোকে চারটি গ্রুপে ভাগ করে। যাদের মাথাপিছু জাতীয় আয় ১ হাজার ৪৫ মার্কিন ডলার বা তার নিচে, তাদের বলা হয় নিম্ন আয়ের দেশ। বাংলাদেশ স্বাধীনতার পর থেকে এ তালিকাতেই ছিল। কিন্তু বর্তমান সরকার গৃহীত উন্নয়ন পরিকল্পনা ও মানুষের গড় আয়, গড় আয়ু, কর্মসংস্থান, রিজার্ভ, রেমিটেন্স প্রভৃতির ক্ষেত্রে ইতিবাচক অবস্থান বাংলাদেশের অর্থনীতিকে শক্ত ভিত্তির ওপর দাঁড় করিয়েছে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) ঘোষিত সর্বশেষ সাময়িক হিসাব অনুযায়ী বাংলাদেশের জনগণের মাথাপিছু আয় ১৭৫২ মার্কিন ডলার। তাই বলা যায় বাংলাদেশের অর্থনীতি ধারাবাহিকভাবে এগিয়ে যাচ্ছে এবং বিশ্বব্যাংকের ঘোষণা দেশের ধারাবাহিক অর্থনৈতিক উন্নয়নেরই প্রতিফলন ও স্বীকৃতি।

বিশ্বব্যাংক বলেছে, বাংলাদেশের অগ্রগতি যেভাবে হচ্ছে, বড় ধরনের কোনো ব্যত্যয় না ঘটলে ২০২৪ সালে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের কাতারে শামিল হবে। এটি যেমন মর্যাদার তেমনি এর সঙ্গে বেশ কিছু অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জও যুক্ত হবে। এখন এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় দক্ষতার পরিচয় দিতে হবে। উন্নয়নশীল দেশ হওয়ার পর বাংলাদেশ এলডিসি হিসেবে বাণিজ্যে যে অগ্রাধিকার সুবিধা পায় তার সবটুকু পাবে না। আবার বৈদেশিক ঋণে কম সুদ ও নমনীয় শর্তও সীমিত হয়ে আসবে। এসব চ্যালেঞ্জ মোকাবিলার প্রস্তুতি প্রয়োজন। উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা লাভের পর যেসব সমস্যা তৈরি হবে তা কাটিয়ে উঠতে ইতোমধ্যে জাতীয় টাস্কফোর্স গঠন করা হয়েছে। এলডিসি স্ট্যাটাস থেকে উত্তরণ হলে বাংলাদেশের অনুকূলে প্রাপ্ত বাণিজ্য ও উন্নয়ন সহায়তা যাতে কোনভাবে হ্রাস না পায় সেজন্য কাজ শুরু করেছে সরকার। এ উপলক্ষে ২২ মার্চ থেকে বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও বিভাগ সেবা সপ্তাহসহ নানা কর্মসূচি পালন করেছে।

উন্নয়নের জন্য প্রয়োজন স্থিতিশীলতা ও ধারাবাহিকতা। গত নয় বছরে সকল উন্নয়ন পরিকল্পনার ধারাবাহিক বাস্তবায়নের কারণেই বাংলাদেশ আজ এ পর্যায়ে আসতে পেরেছে। ধারাবাহিকতা, টেকসই ব্যবস্থাপনা ও কঠোর পরিশ্রমের মাধ্যমে একসময় উন্নয়নশীল দেশ থেকে উন্নত দেশেও পরিনত হবে বাংলাদেশ- অপেক্ষা এখন সে দিনের।

#

০৫.০৪.২০১৮ পিআইডি প্রবন্ধ

সমবায় একটি দর্শন

মো. আহসান করিম চৌধুরী

সমবায় একটি দর্শন। এটা এমন একটি কৌশল যার মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্য দূর করে একটি শান্তিপূর্ণ সমাজ গড়ে তোলা সম্ভব। বাংলাদেশ সদ্য স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশ হওয়ার পথে যাত্রা শুরু করেছে। আমাদের মত উন্নয়নশীল দেশের জনগোষ্ঠীকে দারিদ্রতা থেকে মুক্তি ও স্বনির্ভর করে গড়ে তোলার জন্য সমবায়ের পথ ধরেই এগোতে হবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সমবায়ের মাধ্যমে এ দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নের স্বপ্ন দেখেছিলেন। কৃষি, ভূমি ব্যবস্থাপনা, শিল্প উদ্যোগ, কৃষি ঋণ বিতরণসহ সকল ক্ষেত্রে সমবায় কৌশলকে কাজে লাগিয়ে স্থায়ী অর্থনৈতিক কাঠামো গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন এবং এ জন্য তিনি সংবিধানে সমবায়কে মালিকানার দ্বিতীয় খাত হিসেবে স্বীকৃতি দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, "আমার দেশের প্রতিটি মানুষ খাদ্য পাবে, আশ্রয় পাবে, শিক্ষা পাবে, উন্নত জীবনের অধিকারী হবে - এই হচ্ছে আমার স্বপ্ন। এই পরিপ্রেক্ষিতে গণমুখী সমবায় আন্দোলনকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতে হবে"।

বঙ্গবন্ধু চেয়েছিলেন, সমবায়ের মাধ্যমে গরীব চাষিরা উপকৃত হবে, তারা যৌথভাবে উৎপাদন যন্ত্রের মালিক হবে, শোষণ থেকে মুক্ত হবে। পাশাপাশি শ্রমিক, তাঁতী, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীরা পুঁজি সঞ্চয় করে একজোট হয়ে নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তন করতে পারবে। তাঁর স্বপ্ন ছিল, সমবায়ের মাধ্যমে সাধারণ কৃষক, শ্রমিক এবং ভূমিহীন নির্যাতিত দুঃখী মানুষের মালিকানায় গ্রামাঞ্চলে ক্ষুদ্র শিল্প গড়ে উঠবে।

বর্তমান সরকার সমতাভিত্তিক একটি বিশ্ব গঠনের লক্ষ্যে জাতিসংঘের "সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা"-র ধারাবাহিকতায় 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা - ২০৩০' গ্রহণ করেছে। এ লক্ষ্যমাত্রা অর্জনকে সামনে রেখে বর্তমান সরকার ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করছে। এ পরিকল্পনায় ব্যক্তি ও সরকারি খাতের পাশাপাশি সমবায়কে উন্নয়নের অন্যতম কৌশল হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনা ও দক্ষ নেতৃত্বে আমরা এমডিজির লক্ষ্যমাত্রা ভালোভাবে অর্জন করতে পেরেছি। ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম আয়ের ও ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত দেশে পরিণত হতে সরকার বদ্ধপরিকর। উৎপাদনমুখী সমবায় এ লক্ষ্য পূরণে অন্যতম হাতিয়ার হিসেবে কাজ করছে।

সমবায়কে নতুন প্রাণ দিতে ও সাধারণ সমবায়ীদের নিকট সহজবোধ্য করার লক্ষ্যে বাংলা ভাষায় সমবায় আইন প্রণয়ন করা হয়েছে। এছাড়া "জাতীয় সমবায় নীতিমালা ২০১৩" এবং "সংশোধিত সমবায় আইন ২০১৩" প্রণয়ন করা হয়েছে। বর্তমান সময়ের চাহিদা বিবেচনায় সমবায় খাতকে শক্তিশালী করার লক্ষ্যে নতুন সমবায় আইন তৈরি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

সোনার বাংলা গঠনের লক্ষ্যে দেশের সমবায়ীরা কাজ করছে নিরলসভাবে। বঙ্গবন্ধুর সৃষ্ট সমবায় আন্দোলন কেন্দ্রিক মানবিক উন্নয়ন দর্শনের ধারাবাহিকতায় দেশে বর্তমানে ১ লক্ষ ৭৫ হাজার ৭৭০টি নিবন্ধিত সমবায় প্রতিষ্ঠানে প্রায় ১ কোটি ০৬ লক্ষ ৯০ হাজার ৭২৮ জন সদস্য রয়েছে। সমবায় সমিতিগুলোর কার্যকরী মূলধন প্রায় ১৪ হাজার ৫৪ কোটি টাকা এবং মোট সম্পদের পরিমাণ প্রায় ৭ হাজার ৩২ কোটি টাকা। এ সকল সমবায়ের মাধ্যমে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ৮ লক্ষ ২৬ হাজার ৭২৮ জন লোকের কর্মসংস্থান হয়েছে। ইতোমধ্যে আশ্রয়ণ প্রকল্পের আওতায় ছিন্নমূল মানুষদের সমবায়ের ভিত্তিতে সংগঠিত করে গৃহ ও ক্ষুদ্র ঋণ প্রদানের মাধ্যমে পুনর্বাসনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এ প্রকল্পের মাধ্যমে ৯৩ হাজার ১১৫টি পরিবারকে আশ্রয় দেওয়া হয়েছে। সাথে সাথে তাদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও প্রায় ১০৩ কোটি টাকা ঋণ সহায়তা প্রদান করে স্বাবলম্বী হিসেবে গড়ে তোলা হচ্ছে। এ উদ্যোগকে আরও সম্প্রসারিত করে দেশের প্রতিটি ঘরহীন মানুষের আশ্রয়ের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে।

সমবায়ের মাধ্যমে দুগ্ধ খাতের উন্নয়ন এবং মাংসের চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। দুগ্ধ খাতের উন্নয়নে বর্তমানে সমবায় অধিদপ্তর ৬৮ কোটি টাকা ব্যয়ে একটি প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে। এর ফলে সুবিধাবঞ্চিত নারী, বেকার যুবকদের জীবিকা অর্জনের পথ সুগম হয়েছে এবং কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পেয়েছে। একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের আওতায় সারাদেশে ২৯টি উপজেলায় ক্ষুদ্র-নৃতাত্ত্বিক জনগোষ্ঠীর জীবনযাত্রার উন্নয়নে সমবায় অধিদপ্তর বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে।

সমবায় সামাজিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নের একটি শক্তিশালী কৌশল। বর্তমান পুঁজিবাজার অর্থনীতির গুরুত্ব বিবেচনায় নিয়ে সমবায় উদ্যোক্তা সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের ব্যবস্থা নিতে হবে। এজন্য প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা। দেশে টেকসই সমবায় গড়ে তুলতে হবে। এ লক্ষ্যে দক্ষ প্রশাসন, সৎ সমবায়ী নেতৃত্ব, আধুনিক তথ্য প্রযুক্তিনির্ভর সমিতি ব্যবস্থাপনা এবং সকল ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে হবে। এ ক্ষেত্রে সরকার সমবায়ীদের সকল ধরনের সহযোগিতা প্রদান করবে। সমবায়ের নামে কোনো অসাধু ব্যক্তি যাতে কোনো ধরনের অপতৎপরতা চালাতে না পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে।

উৎপাদনমুখী সমবায় নিশ্চিত করতে প্রতিটি গ্রামে সমবায়ভিত্তিক মৎস্য খামার, গবাদি পশুর খামার, হাঁস-মুরগির খামার, সামাজিক বনায়ন সমিতির মাধ্যমে পরিবেশের উন্নয়ন, তাঁত ও সেলাই, হস্ত শিল্প, ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প, মৃৎ শিল্প, খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ইত্যাদি উন্নয়নমূলক প্রকল্প বাস্তবায়ন করতে হবে। শিক্ষিত-অর্ধ শিক্ষিত বেকার ও কর্মক্ষম যুব সম্প্রদায়কে বিভিন্ন প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও প্রশিক্ষণ, পোল্ট্রি, কম্পিউটার, গবাদি পশু পালন, ব্লক-বাটিক ও স্ক্রিন প্রিন্ট ইত্যাদি কর্মমুখী প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করতে হবে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যুবকরা নিজেরাই সমবায় সমিতি গঠনের মাধ্যমে পুঁজি সংগ্রহ করে ছোটো পরিসরে হলেও বিভিন্ন খামার বা ক্ষুদ্র শিল্প স্থাপন করে নিজেদের স্বনির্ভরতার পাশাপাশি নতুন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে পারে। সমবায়ীদের মধ্যে শিক্ষা, সততা, নৈতিকতা, সামাজিক ও মানবিক মূল্যবোধ, গণতান্ত্রিক মনোভাব গড়ে তুলতে হবে।

একটি সুখী ও সমৃদ্ধ দেশ গঠনে জননেত্রী সরকারের উদ্যোগকে শক্তিশালী করতে সকলকে একযোগে কাজ করতে হবে। সারাদেশে ১ কোটি সমবায়ী ভাই-বোনদের সরকারের সমবায় বান্ধব কর্মসূচিসমূহকে সহায়তা করতে হবে। সমবায়ের মতো শক্তিশালী সামাজিক শক্তিকে কাজে লাগিয়ে সমবায়কে একটি দর্শনে রূপান্তর করা সম্ভব।

#

০৫.০৪.২০১৮ পিআইডি প্রবন্ধ

অটিজম ও আমি

অধ্যাপক আয়েশা পারভিন চৌধুরী

আমি তোমাদেরই একজন। তোমাদের মত আমারও মা-বাবা, ভাই-বোন, দাদা-দাদী সবাই আছে। তবুও আমি জানি না, আমি কে? আমার অস্তিত্ব, আমার চারপাশের মানুষ ও পরিবেশ সবকিছুই কেমন বেমানান। তোমাদের মতো স্বাভাবিক নিয়মে আমি আমাকে উপস্থাপন করতে পারি না। আমি আমার চাওয়া-পাওয়াগুলোকে প্রকাশ করতে পারি না। আমার সবকিছুই একটি নির্দিষ্ট নিয়মে চলে। খিদে পেলে আমি বলতে পারি না। বাথরুম আসলে যেখানে-সেখানে পেশাব-পায়খানা করে দিই। কল্পনার রাজ্যে নিজেকে সাজিয়ে খেলতে পারি না। শব্দ হয় এই ধরনের জিনিস ফেলে দিয়ে আনন্দ পাই। আমি গান ও সুর পছন্দ করি। টিভিতে কোনো গান চললেই আমি দৌড়ে টিভি সেটের সামনে চলে আসি। আমার অনেক অনেক খেলনা। কিন্তু আমি ঐ খেলনাগুলো দিয়ে খেলি না। আমি কোনো অর্থপূর্ণ খেলা খেলতে সক্ষম নই। শুধু বল, বেলুন, বোতল ভালো লাগে। ঘুম আসলে আমি বলতে পারি না। বেড়াতে যেতে ইচ্ছা করে কী না, তাও জানি না। কেউ আমার ভালো লাগা ও মন্দ লাগা বুঝে না। অবশ্য আমি নিজেই তো অন্যের ভালো-মন্দগুলো বুঝি না। খেলতে খেলতে সবাইকে হঠাৎ মেরে বসি। আদর করার জন্য কেউ কোলে নিলে ধুম করে মাথা দিয়ে ব্যাথা দিই।

আমি আদরের সন্তান। অথচ আমি আদরও বুঝি না। মা, আমাকে কত যে আদর করে? তবুও কখনো মাকে-"মা" বলে ডাকিনি। কখনো জড়িয়ে ধরে চুমু দেইনি। মা, আমাকে কোলে নিয়ে কত গান, কবিতা, ছড়া শুনায়। মা জানে, আমি ওগুলোর কিছুই বুঝি না, শুনিও না। তবুও মা নিজের আনন্দে গান, কবিতা, ছড়া বলতে থাকেন। বাসার সবাই আমাকে নিয়ে ব্যস্ত থাকে। কখন যে খেলার ছলে টেবিলের সব কিছু ফেলে দিই, তাও জানি না। গ্লাস / কাঁচ জাতীয় কিছু ফেলতে পারলে আমার কী যে আনন্দ! পরার শব্দটি খুব ভালো লাগে বলে ভাঙ্গা জিনিসটা আবার ছোঁড়ার জন্য হাতে তুলে নিই। আমি কেমন বোকা, দেখ না। হাত কেঁটে যাবে তাও বুঝি না। আমি ব্যাথা পেলে সবাই দৌড়িয়ে আসে। ফুলে গেলে অথবা রক্ত ঝড়লে আমার ব্যথার জায়গাতে আদর করে দেয়, ওষুধ লাগিয়ে দেয়। কিন্তু অন্য সময় আমার কান্নার সাথে সাথে সবাই শুধু আদর করতে থাকে। আমি তো অন্যান্য বাচ্চাদের মতো ব্যাথা করলে অনেক কাঁদতে পারি না। তাই সবাই ক্ষণিকেই তাদের কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। আমাকে নিয়ে কোথাও বেড়াতে গেলে অস্বস্তি লাগে। আমি খাপ খাওয়াতে পারি না। আমি তখন সবাইকে বিরক্ত করতে থাকি। সবাই আমার দিকে কেমন যেন তাকিয়ে থাকে। ফিস ফিস করে নিজেরা কী যেন বলে। আমি শুধু দৌড়াতে পারি। যখন দৌড়াতে শুরু করি, তখন এই রুম থেকে ঐ রুমে শুধু দৌড়াতেই থাকি। যখন হাসতে শুরু করি তখন কী যে হাসি! থামতে চায় না। পাখি যেমন ডানা ঝাপটায় তেমনি আমিও জোড়ে জোড়ে হাত নাড়াতে থাকি। মুখে প্রকাশ করার ক্ষমতা নেই বলে বিভিন্ন আচরণ করে থাকি। আমার জেদ অনেক বেশি। কোনো কারণে জেদ উঠলে হাত দিয়ে মুখে, মাথায় মারতে থাকি। নাকে-মুখে রক্ত গড়াতে থাকে। আমার জেদের কাছে সবাই হার মানে। আমি যে শুনতে পাই তা কেউ বুঝতে চায় না। আমি নিজের অজান্তে আব্বু, আম্মু, আপু, বাবু, মামা, দাদা বলে থাকি। না শুনলে, এই শব্দগুলো কোথা থেকে শিখলাম? অবশ্য আমার এই শব্দ উচ্চারণের কোনো দাম নেই। কারণ অর্থপূর্ণ শব্দ দিয়ে আমি অন্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারি না। এটাই আমার সমস্যা। মানসিক বিকাশগত সমস্যা। একেই বলে অটিজম।

তোমাদের কেউ কেউ আমাদেরকে নিয়ে অনেক সভা-সেমিনার করে থাক। আমাদেরকে নিয়ে অনেক সুন্দর সুন্দর কথা হয়। আমরা নাকী ঈশ্বরের দান। আমাদের কোনো পাপ নেই, আমরা নিষ্পাপ। এমন নিষ্পাপ মানুষকে সবাই ভালবাসা ও সম্মান করার কথা। কিন্তু বাস্তবে কি তাই হয়? এখন তো আমাদেরকে নিয়ে বিশ্বব্যাপী একটি দিবসও পালিত হয়। আমাদেরকে স্বাভাবিক জীবনে অভ্যস্ত করার জন্য বার বার আহবান করা হয়। আমারও ইচ্ছা হয় তোমাদের মতো ঘুরে বেড়াই, খেলার মাঠে দৌড়-ঝাপ করি, স্কুলে সবার সাথে পড়ালেখা করি, আত্মীয়-স্বজনের বাড়িতে বেড়াতে যাই, সবার সাথে নানান অনুষ্ঠানে গিয়ে আনন্দ করি। তোমরা আমাকে তোমাদের মাঝে বড় হতে দাও। তোমরা এমন কিছু বলবে না, যাতে আমার মা-বাবা, ভাই-বোন কোনো অস্বস্তিকর পরিবেশে পড়ে। আমাকে আদর করলে, আমাকে সহজভাবে নিলে, আমাকে ভালবাসলে আমার পরিবারও একটি সুন্দর জীবন পাবে। তোমাদের করুণা করতে বলিনি। সহানুভুতির হাতটুকু শুধু বাড়িয়ে দাও।। আমার জন্য করতে পারা তোমাদের আনন্দ ছাড়া কষ্ট দেবে না। তখন নিজেকে সত্যিকার মানুষ হিসাবে আবিষ্কার করবে। তুমিই পারবে।

#

০৪.০৪.২০১৮ পিআইডি প্রবন্ধ

আধুনিক পরিসংখ্যান পদ্ধতিঃ উন্নয়ন পরিকল্পনার পূর্বশর্ত

মোঃ মঞ্জুর-ই-মওলা

বাংলাদেশ এগিয়ে যাচ্ছে দ্রুতগতিতে। ২০২১ সালের মধ্যে মধ্যম এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ দেশে পরিণত হবার পথে বাংলাদেশ যে সঠিক পথেই এগুচ্ছে তার একটি স্বীকৃতি মাত্রই পেয়েছে বাংলাদেশ। জাতিসংঘের কমিটি ফর ডেভেলাপমেন্ট পলিসি (সিডিপি)-এর মূল্যায়নে বাংলাদেশ স্বপোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জন করেছে। নানা আনুষ্ঠানিকতা শেষে ২০২৪ সালে বাংলাদেশ চূড়ান্তভাবে উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা লাভ করবে।

যে কোনো দেশের উন্নয়ণের জন্য সঠিক তথ্য-উপাত্ত খুব গুরুত্বপূর্ণ। দেশটির বর্তমান উন্নয়নের অবস্থান কি, উন্নয়নের কোন স্তরে দেশটি যেতে চায়, কীভাবে সে লক্ষ্যে পৌছাবে- সবকিছু নির্ভর করে সঠিক তথ্য-উপাত্ত বা পরিসংখ্যানের ওপর। সঠিক প্রয়োজন বা চাহিদা নিরুপণের মাধ্যমেই উন্নয়নের কার্যকর নীতি ও পরিকল্পনা প্রণয়ন করা সম্ভব । তাই আমাদেরকে আধুনিক পরিসংখ্যান পদ্ধতি প্রণয়নের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে।

আধুনিক জনমিতিক পরিসংখ্যানের মাধ্যমে সঠিক নীতি ও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য বর্তমান বিশ্বে Civil Registration and Vital Statistics (CRVS) ব্যবস্থা চালু হয়েছে। ১০ ডিজিটবিশিষ্ট একটি অনন্য আইডি (Unique ID) ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে নাগরিকের জীবনপ্রবাহের উল্লেখযোগ্য ঘটনাসমূহ তথ্য-উপাত্ত আকারে সংরক্ষণ এবং এর ভিত্তিতে সরকারের সকল সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে CRVS উদ্যোগের সূত্রপাত। বৈশ্বিক লক্ষ্য 'Get everyone in the picture' বাস্তবায়নের নিমিত্তে রাষ্ট্রের প্রত্যেক নাগরিককে চিহ্নিতকরণের মাধ্যমে তার জীবনের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও তথ্যাদি, যেমন; জন্ম, মৃত্যু ইত্যাদি সংঘটিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে নিবন্ধিত করা (civil registry) এবং তার ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় সকল ধরণের পরিসংখ্যান (vital statistics) তৈরি করার নিয়মিত প্রশাসনিক প্রক্রিয়াই হলো CRVS।

বাংলাদেশে বিভিন্ন সরকারি সংস্থা (প্রধানতঃ স্থানীয় সরকার বিভাগ, পরিসংখ্যান ও তথ্য ব্যবস্থাপনা বিভাগ এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়) বহু আগে থেকেই 'Civil Registration' এবং 'Vital Statistics' কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে চলেছে। তবে পৃথকভাবে হওয়ায় এসকল কার্যক্রমে দ্বৈততা, অসামঞ্জস্য এবং কখনো কখনো বৈপরিত্য দেখা যায়। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য একটি সমন্বিত ও কার্যকর CRVS ব্যবস্থা গড়ে তুলতে বাংলাদেশে ২০১৫ সালে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে CRVS সচিবালয় স্থাপিত হয়।

গত জানুয়ারিতে দেশে প্রথমবারের মতো CRVS বিষয়ক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্মেলনে বিভিন্ন দেশ থেকে আগত ৩০ জন প্রতিনিধি বিভিন্ন সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন। আন্তর্জাতিকভাবে জন্ম (birth), মৃত্যু (death), মৃত্যুর কারণ (cause of death), বিবাহ (marriage), তালাক (divorce) এবং দত্তক (adoption) - এ ছয়টি বিষয়ই CRVS এর অংশ হিসেবে স্বীকৃত। কিন্তু বাংলাদেশ এ ছয়টি বিষয়ের পাশাপাশি জনগণের স্থানান্তর (in and out-migration) এবং শিক্ষাকে (education) অন্তর্ভুক্ত করে CRVS and Beyond নামে জনগণের সেবাপ্রদান প্রক্রিয়ায় বিশেষতঃ সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী কর্মসূচিসমূহের সাথে একে সংযুক্ত করার উদ্যোগ নিয়েছে। এজন্য একটি সমন্বিত সেবাপ্রদান ব্যবস্থাপনা (Integrated Service Delivery Platform-ISDP) গড়ে তোলা হবে। বাংলাদেশ গৃহীত অতিরিক্ত দু'টি বিষয়কে অন্যান্য দেশও CRVS কর্মসূচির সাথে অন্তর্ভুক্ত করার বিষয়ে আগ্রহ প্রকাশ করেছে।

দেশে CRVS and Beyond এর অংশ হিসেবে জন্ম, মৃত্যু এবং মৃত্যুর কারণ নিবন্ধন কর্মসূচি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে গাজীপুর জেলার কালীগঞ্জ উপজেলাকে মডেল হিসেবে নির্বাচিত করে ২০১৬ সালের এপ্রিল মাসে কার্যক্রম শুরু হয়। ২০১৪ সালের ১ জুলাই স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের এক পরিপত্রে উপজেলার ইউনিয়নসমূহে কর্মরত স্বাস্থ্যকর্মী (HA) এবং পরিবার কল্যাণকর্মীদেরকে (FWA) ৪৫ দিনের মধ্যে জন্ম বা মৃত্যু নিবন্ধনে সহায়তা প্রদানের জন্য দায়িত্ব দেওয়া হয়। জন্ম বা মৃত্যু নিবন্ধনের জন্য প্রয়োজনীয় ফরম ইউনিয়ন পরিষদ থেকে বিনামূল্যে সরবরাহের ব্যবস্থা নেয়া হয়। জন্ম নিবন্ধন কার্যক্রমে গুরুত্বারোপের লক্ষ্যে শিশুর ইপিআই টিকাদান কার্ডে এবং রেজিস্টারে শিশুর জন্ম নিবন্ধন সনদের নম্বর উল্লেখের বিধান বাধ্যতামূলক করা হয়।

জন্ম বা মৃত্যু নিবন্ধনের জন্য কালীগঞ্জ উপজেলার ইউনিয়ন পর্যায়ে স্বাস্থ্য সহকারী/ পরিবার কল্যাণ সহকারী শিশু অথবা মৃত ব্যক্তির পরিবার প্রদত্ত জন্ম/ মৃত্যু সংক্রান্ত তথ্য নিয়ে সংশ্লিষ্ট আবেদন ফরম পূরণ করে আবেদনপত্রে পরিবার প্রধান/ অভিভাবকের স্বাক্ষর গ্রহণ করেন। এরপর সে আবেদনপত্রগুলো ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রের সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক/ পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শকের কাছে জমা দেন। সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক/পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক আবেদনপত্রসমূহ যাচাই করে ইউনিয়ন জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধক (সাধারণত ইউপি চেয়ারম্যান) কার্যালয়ে জমা দেবেন। এরপর ইউনিয়ন জন্ম-মৃত্যু নিবন্ধক জন্ম/ মৃত্যু সনদ ইস্যু এবং বিতরণ করবেন।

মৃত্যুর কারণ নিবন্ধনের ক্ষেত্রে যদি কারো নিজ বাসস্থানে স্বাভাবিক মৃত্যু ঘটে তবে মৃত্যুকালে উপস্থিত নিকটতম আত্মীয় প্রদত্ত মৌখিক ময়নাতদন্তের (Verbal Autopsy) মাধ্যমে মৃত্যুর কারণ সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও নিবন্ধন করা হবে। আর যদি ইউনিয়ন স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্রে মৃত্যু ঘটে তাহলে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্ধারিত Medical Certificate of Cause of Death (MCCoD) এর মাধ্যমে এ তথ্য সংগ্রহ ও নিবন্ধন করা হবে। কালীগঞ্জ মডেল অনুসরণ করে বর্তমানে ঢাকার বাইরের ৬টি বিভাগের ৬টি উপজেলা, কালীগঞ্জসহ গাজীপুরের ৫টি উপজেলা এবং ময়মনসিংহের ২টি উপজেলা-এই সর্বমোট ১৩টি উপজেলায় পাইলটিং এর মাধ্যমে এ কর্মসূচির সম্ভাব্যতা যাচাই করা হচ্ছে।

দেশব্যাপী CRVS কর্মসূচির আওতায় ইতোমধ্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, শহীদ সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, সিলেট এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল, গাজীপুর শহীদ তাজউদ্দীন মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এবং কালীগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের সর্বমোট ২৭৯০ জন চিকিৎসককে MCCoD বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্য সহকারী, পরিবার কল্যাণ সহকারী, সহকারী স্বাস্থ্য পরিদর্শক, পরিবার পরিকল্পনা পরিদর্শক, ইউডিসি উদ্যোক্তা ও ইউপি চেয়ারম্যানসহ ২৯৪ জনকে জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন বিষয়ে ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়েছে। পাশাপাশি কালীগঞ্জ উপজেলায় ৬০ জনকে Verbal Autopsy বিষয়ে প্রশিক্ষণ এবং ২০ জনকে মাস্টার ট্রেইনার হিসেবে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। কর্মসূচি বাস্তবায়নাধীন এলাকায় জন্ম নিবন্ধন শতকরা ৯৫ ভাগ এবং মৃত্যু নিবন্ধন শতকরা ৮৫ ভাগে উন্নীত হয়েছে।

CRVS কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে উন্নয়ন সহযোগী বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা (WHO), ইউনিসেফ (UNICEF), UNESCAP (United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific), Bloomberg Philanthropies, Data for Health Initiative এবং Plan International সকলেই তাদের সহযোগিতার ধারা অব্যাহত রাখার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। এ কর্মসূচি সফলভাবে বাস্তবায়ন সম্ভব হলে বিদ্যমান আদমশুমারী ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন সাধিত হবে এবং আরও সুনিপুণভাবে উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়ন করা যাবে বলে আশা করা যায়।

#

০৪.০৪.২০১৮ পিআইডি প্রবন্ধ

রপ্তানি বাণিজ্যে এগিয়ে যাচ্ছে বাংলাদেশ

মো. আব্দুল লতিফ বকসী

মেড ইন বাংলাদেশ। বিশ্ববাজারে এখন বেশ পরিচিত একটি শব্দ। উন্নত বিশ্ব বাংলাদেশের তৈরি পণ্য দেখে এখন আর দৃষ্টি ঘুড়িয়ে নেয় না। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকেই আমরা শুনছি বাংলাদেশ হলো তলাবিহীন ঝুড়ি। আবার কেউ বলতো- বাংলাদেশ হলো, বিশ্বের দরিদ্র দেশের মডেল, কেউ কেউ মন্তব্য করতো- বাংলাদেশের উন্নতি হলে, পৃথিবীতে আর কোনো দেশ দরিদ্র থাকবে না। আজ সেই মানুষগুলোই বলছেন, বাংলাদেশ উন্নয়নের রোল মডেল।

রপ্তানি বাণিজ্যে বাংলাদেশের উন্নতি চোখে পড়ার মতো। ১৯৭২-৭৩ সালে বাংলাদেশ ২৫ টি পণ্য ৬৮টি দেশে রপ্তানি করে আয় করতো মাত্র ৩৪৮.৪২ মিলিয়ন মার্কিন ডলার। গত বছর অর্থাৎ ২০১৬-২০১৭ অর্থবছরে ৭৪৪টি পণ্য বিশ্বের ১৯৮টি দেশে রপ্তানি করে বাংলাদেশ আয় করেছে প্রায় ৩৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। আমাদের রপ্তানির প্রধান খাত দুইটি। একটি পণ্য রপ্তানি আর একটি সেবা রপ্তানি। আমরা রপ্তানি বলতে শুধু পণ্যকে বুঝালেও সেবা খাতটিও বেশ গুরুত্বপূর্ণ। ২০১৬-২০১৭ অর্থ বছরে সেবা রপ্তানি থেকে আয় হয়েছে ৩.১৭৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। চলতি ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে পণ্য রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ৩৭.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং সার্ভিস সেক্টরে ৩.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। অর্থবছরের প্রথম তিন মাসে পণ্য রপ্তানিতে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ৭.২৩ ভাগ এবং সার্ভিস সেক্টরে প্রবৃদ্ধি হয়েছে ২৩.৬৭ ভাগ। এ ধারা অব্যাহত থাকলে রপ্তানি লক্ষ্যমাত্রা ছাড়িয়ে যাবে বলে আশা করা যায়।

সরকার ৭ম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় রপ্তানি পণ্য সংখ্যাবৃদ্ধি এবং রপ্তানি বাজার সম্প্রসারণে বেশি গুরুত্ব দিয়েছে। সে অনুযায়ী বিভিন্ন পণ্য রপ্তানিতে নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদানসহ বিভিন্ন ধরনের ব্যবসায়িক সহযোগিতা প্রদান করে রপ্তানিতে উৎসাহ প্রদান করা হচ্ছে। রপ্তানি বাড়াতে ট্রেডিশনাল পণ্যের পাশাপাশি নন-ট্রেডিশনাল পণ্যের ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। কারণ বাংলাদেশের এমন অনেক পণ্য রয়েছে বিশ্ববাজারে ব্যাপক চাহিদার কারণে যেগুলোর রপ্তানি সম্ভাবনা ব্যাপক। এ পণ্যগুলো হলো- তথ্যপ্রযুক্তি (আইটি), ঔষধ, চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য, জাহাজ নির্মাণ, ফার্নিচার ও কৃষিজাত পণ্য। বিশ্ববাজারে এ পণ্যগুলোর চাহিদা দিনদিন বাড়ছে।

রপ্তানির ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যও নানাবিধ উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। রপ্তানিকারকদের উৎসাহিত করতে সরকার আন্তরিকতার সাথে সহায়তা দিয়ে যাচ্ছে। এখন কৃষিপণ্য রপ্তানিতে ২০ শতাংশ, চামড়াজাত পণ্য রপ্তানিতে ১৫ শতাংশ ও যারা সাভার চামড়া শিল্পনগরী থেকে রপ্তানি করবেন তাদের জন্য আরো ৫ শতাংশসহ মোট ২০ শতাংশ, জাহাজ রপ্তানিতে ১০ শতাংশ এবং ফার্নিচার রপ্তানিতে ১৫ শতাংশ হারে নগদ আর্থিক সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। ফলে রপ্তানি দিনদিন বাড়ছে।

পাট, চা, চামড়া দিয়ে বাংলাদেশের রপ্তানির যাত্রা শুরু হলেও তৈরি পোশাক রপ্তানিতে বিপ্লব ঘটানোর মাধ্যমে শুরু হয় বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের নতুনযাত্রা। দেশের মোট রপ্তানি প্রায় ৮০.৮১ ভাগ আসে তৈরি পোশাক রপ্তানি থেকে। এ সেক্টরে প্রায় ৪৫ লক্ষ মানুষ কাজ করার সুযোগ পাচ্ছে। এ পরিবারগুলোতে এসেছে আর্থিক স্বচ্ছলতা। দ্রুত কমে এসেছে দরিদ্র পরিবারের সংখ্যা দেশি-বিদেশি অনেক বাধা অতিক্রম করে এগিয়ে যাচ্ছে তৈরি পোশাক শিল্প। ২০১৩ সালে অপ্রত্যাশিত রানা প্লাজা দুর্ঘটনায় বাংলাদেশের তৈরি পোশাক রপ্তানিতে নতুন বাধা আসে। হোচট খায় বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্য। ক্রেতাগোষ্টি বেধে দেয় ১৬টি শর্ত। তৈরি পোশাক কারখানাগুলো নিরাপদ করতে ইউরোপিয় ইউনিয়নের ক্রেতাদের পক্ষে এ্যাকর্ড এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এ্যালায়েন্স ও ন্যাশনাল ইনিশিয়েটিভ নামে তিনটি সংস্থা কঠোর নজরদারি শুরু করে। বাংলাদেশ সকল পরিস্থিতি সফলভাবে মোকাবিলা করে এগিয়ে যায়। সরকার ও রপ্তানিকারকদের বিশেষ উদ্যোগে বাংলাদেশের পোশাক কারখানাগুলো পরিণত কমপ্লায়েন্স ফ্যাক্টরিতে। ফলে এ সেক্টর শক্তভিত্তির ওপর দাঁড়িয়েছে।

বাংলাদেশ এখন তৈরি পোশাক রপ্তানিতে দ্বিতীয় বৃহত্তম রপ্তানিকারক দেশ। গত অর্থবছরে যে ৩৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য বাংলাদেশ রপ্তানি করেছে, তার মধ্যে ২৮.১৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থাৎ ৮০.৮১ ভাগ হলো তৈরি পোশাক। এ বছর ইউরোর অবমূল্যায়নের ফলে টাকার অংকে তৈরি পোশাকের রপ্তানি মূল্য কম পাওয়া গেছে। তবে রপ্তানির পরিমাণ সংখ্যায় কমেনি।

বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা ২০৩৩ সালের জানুয়ারি পর্যন্ত বাংলাদেশসহ স্বল্পোন্নত দেশসমূহকে রয়েলটি প্রদান ব্যতিরেকে প্যাটেন্ট ঔষধ উৎপাদন এবং উন্নত দেশসমূহে বিপণনের সুযোগ প্রদান করেছে। দেশের অনেক ঔষধ প্রস্তুতকারক কোম্পানি বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে ঔষধ রপ্তানির জন্য নিবন্ধিত ও তালিকাভুক্ত হয়েছে। ট্রিপস চুক্তির (এলডিসিভুক্ত দেশ থেকে উন্নত বিশ্বে ঔষধ রপ্তানির ক্ষেত্রে শর্ত শিথিল চুক্তি) মেয়াদ বৃদ্ধি করার কারণে বাংলাদেশের জন্য ঔষধ রপ্তানির সুবর্ণ সুযোগ এসেছে। বাংলাদেশে এখন বিশ্বমানের ঔষধ কারখানা রয়েছে, যা অনেক উন্নত দেশেও নেই। বাংলাদেশ এ সুযোগকে কাজে লাগানোর জন্য সবধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে।

বিশ্বে ঔষধের ১৭০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের রপ্তানি বাজার রয়েছে। বাংলাদেশ অতিসহজেই এর ১০ ভাগ রপ্তানি করতে সক্ষম। বাংলাদেশ এখন বিশ্বের ১২৭টি দেশে ঔষধ এবং এর কাচাঁমাল রপ্তানি করছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট, যুক্তরাজ্য, জার্মানী, জাপান ফ্রান্স, সুইডেন, ইতালি, কানাডা, স্পেন, নেদারল্যান্ডসহ বিশ্বর উন্নত দেশে বাংলাদেশের তৈরি ঔষধ রপ্তানি হচ্ছে। আগামী ২০২১ সালের মধ্যে ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার মূল্যের ঔষধ রপ্তানির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করা হয়েছে।

তথ্যপ্রযুক্তি খাত বাংলাদেশের জন্য খুবই সম্ভাবনাময়। এ খাতে আমাদের বিপুল সংখ্যক দক্ষ জনশক্তি রয়েছে, যারা ইতোমধ্যে দেশে-বিদেশে সফলভাবে কাজ করে যাচ্ছে। আধুনিক বিশ্বে তথ্যপ্রযুক্তির একটা বড়ো বাজার রয়েছে। সেখানে ইতোমধ্যে বাংলাদেশেল পণ্য রপ্তানি শুরু হয়েছে। এ মুহূর্তে রপ্তানি ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের মধ্যে থাকলেও ২০২১ সালে এ রপ্তানির পরিমাণ ৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অতিক্রম করবে বলে আশা করা হচ্ছে। মনে করা হচ্ছে, এ সেক্টরটি রপ্তানিতে তৈরি পোশাক খাতকেও ছাড়িয়ে যাবে।

চামড়া ও চামড়াজাত পণ্য এবং ট্রেডিশনাল পণ্যের পাশাপাশি নন-ট্রেডিশনাল পণ্য রপ্তানির বিপুল সম্ভাবনাকে কাজে লাগাতে সরকার ব্যাপক কার্যক্রম হাতে নিয়েছে। প্রধানমন্ত্রী চামড়া খাতকে 'প্রডাক্ট অফ দি ইয়ার-২০১৭' ঘোষণা করেন। বিশ্ব বাজারে বিপুল চাহিদা থাকার পরও কাঁচা চামড়া রপ্তানি নিষিদ্ধ রয়েছে। দেশীয় শিল্পকে উৎসাহিত করে চামড়াজাত পণ্য উৎপাদন করে রপ্তানি করা হচ্ছে।

বাংলাদেশ এলডিসি থেকে উন্নয়নশীল দেশের পথে যাত্রা শুরু করেছে। ২০২৪ সালে চূড়ান্তভাবে বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশে উন্নীত হবে। এরপরও তিন বছর অর্থাৎ ২০২৭ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশ এলডিসি ভুক্ত দেশের বাণিজ্য সুযোগ-সুবিধা ভোগ করতে পারবে। এ ছাড়াও বাংলাদেশকে সর্বাধিক বাণিজ্য সুবিধা প্রদানকারী ইউরোপিয় ইউনিয়ন থেকে জিএসপি প্লাস নামে বাণিজ্য সুবিধা পাবার সুযোগ রয়েছে। তাছাড়া বাংলাদেশ যে কোনো দেশের সাথে ফরেন ট্রেড এগ্রিমেন্ট (এফটিএ) স্বাক্ষরের মাধ্যমে বাণিজ্য সুবিধা পেতে পারে। উন্নয়নশীল দেশের পূর্ণ মর্যাদা অর্জনের পর বাংলাদেশের নিজস্ব বাণিজ্য সক্ষমতাও বৃদ্ধি পাবে। এ সক্ষমতা বাংলাদেশেকে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে আরও শক্ত অবস্থানে নিয়ে যাবে, এ প্রত্যাশা সবার।

#

০৪.০৪.২০১৮ পিআইডি প্রবন্ধ

বজ্রপাতে থাকুন নিরাপদ

মোহাম্মদ ওমর ফারুক দেওয়ান

আবারও এসেছে ঝড়-বৃষ্টি ও বজ্রপাতের সময়। গত কয়েকদিনে দেশের বিভিন্ন স্থানে বজ্রপাতে মারাও গেছে বেশ কয়েকজন। সাধারণত এপ্রিল-জুন মাসে বজ্রপাত বেশি হয়। কিন্তু এ সময়ের বাইরেও আমাদের দেশে বজ্রপাত ও প্রাণহানির ঘটনা ঘটছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের হিসেব অনুযায়ী ২০১১ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত বজ্রপাতে সারাদেশে ১৪০০ মানুষের মৃত্যু হয়েছে। ২০১৬ সালে বজ্রপাতে মাত্র ৪ দিনে মারা যায় ৮১ জন। বাংলাদেশে বজ্রপাতে বিভিন্ন সময়ে মানুষ মারা গেলেও অল্পসময়ে এত বেশি লোক কখনো মারা যায়নি। এ সময় থেকেই মূলত বজ্রপাতের বিষয়টি সকলের নজরে এসেছে।

বজ্রপাত একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ। বিজ্ঞানীদের মতে বজ্রপাতের জন্য দায়ী গভীর ও উলম্ব আকারের মেঘ (Cumulonimbus cloud)। এ আকারের মেঘ আকাশে থাকলে বুঝতে হবে বজ্রপাত হতে পারে। বিশেষ করে বায়ুমণ্ডলে বাতাসের তাপমাত্রা ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগের তুলনায় কম থাকে বিধায় গরম বায়ু দ্রুত ওপরে উঠে গেলে আর্দ্র বায়ুর সংস্পর্শ পায়। তখন গরম বায়ু দ্রুত ঠাণ্ডা হওয়ায় বজ্রমেঘের সৃষ্টিতেই বজ্রপাত সংঘঠিত হয়। বজ্রপাতের সম্ভাব্য অন্যতম কারণগুলোর মধ্যে দীর্ঘ শুষ্ক সময় শেষে আর্দ্রতা, উঁচু বৃক্ষ নিধন, স্থাপনায় বজ্রনিরোধক ব্যবহার না করা ইত্যাদি বিষয়গুলো উল্লেখযোগ্য।

বজ্রপাতের কারণে মৃত্যুর ঝুঁকি কমাতে গণমাধ্যমকে ব্যবহার করে এ বিষয়ে গণসচেতনতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া, সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং মোবাইলে এসএমএস এর মাধ্যমে প্রচারণা চালাতে হবে। পোস্টার/ লিফলেট বিতরণ এবং উঠান বৈঠকের মাধ্যমেও জনগণকে সচেতন করতে হবে। তাছাড়া বাস ও রেল স্টেশন এবং লঞ্চ ঘাট ইত্যাদি জনবহুল জায়গায় প্রচারণা করতে হবে। বজ্রপাত থেকে নিরাপদ থাকতে কিছু করণীয় অবশ্যই মেনে চলা উচিত।

১. গভীর ও উলম্ব মেঘ দেখা দিলে ঘরের বাইরে বের না হওয়া; বাড়ীতে থাকলে জানালা বন্ধ রাখা এবং ঘরের ভিতরে বৈদ্যুতিক সরঞ্জাম থেকে দূরে থাকা;

২. বজ্রঝড় সাধারণত ৩০-৪৫ মিনিট স্থায়ী হয়। এ সময়টুকু ঘরে অবস্থান করা। অতি জরুরি প্রয়োজনে রাবারের জুতা পরে বাইরে যাওয়া;

৩.বজ্রপাতের সময় খোলা জায়গা, মাঠ অথবা উঁচু স্থানে না থাকা এবং যত দ্রুত সম্ভব দালান বা কংক্রিটের ছাউনির নিচে আশ্রয় নেয়া;

৪.বজ্রপাতের সময় ধানক্ষেতে বা খোলা মাঠে থাকলে তাড়াতাড়ি পায়ের আঙ্গুলের ওপর ভর দিয়ে এবং কানে আঙ্গুল দিয়ে মাথা নিচু করে বসে পড়া; সমুদ্র বা নদীতে থাকলে দ্রুত কোনো ছাউনীর নীচে অবস্থান নেয়া;

৫. বজ্রপাতের সম্ভাবনা দেখা দিলে উঁচু গাছপালা, বৈদ্যুতিক খুঁটি ও তার, ধাতব খুঁটি, মোবাইল টাওয়ার ইত্যাদি থেকে দূরে থাকা;

৬. গভীর ও উলম্ব মেঘ দেখা দিলে নদী, পুকুর, ডোবা বা জলাশয় থেকে দূরে থাকা;

৭. বজ্রপাতের সময় গাড়ির ভেতর অবস্থান করলে গাড়ির ধাতব অংশের সাথে শরীরের সংযোগ না রাখা, সম্ভব হলে কোনো কংক্রিটের ছাউনির নিচে আশ্রয় নেয়া;

৮. বজ্রপাত ও ঝড়ের সময় ধাতব হাতলযুক্ত ছাতা ব্যবহার না করা; বাড়ির ধাতব কল, সিঁড়ির ধাতব রেলিং, পাইপ ইত্যাদি স্পর্শ না করা;

৯. প্রতিটি বিল্ডিং-এ বজ্রপাত নিরোধক দণ্ড স্থাপন নিশ্চিত করা। কোনো বাড়িতে যদি পর্যাপ্ত বজ্রপাত নিরোধক ও নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা না থাকলে সবাই এক কক্ষে না থেকে আলাদা আলাদা কক্ষে থাকা;
১০. বজ্রপাতের সময় মোবাইল ফোন, কম্পিউটার, টিভি, ফ্রিজসহ বৈদ্যুতিক যন্ত্রপাতির সুইচ বন্ধ রাখা এবং বজ্রপাতের আভাস পেলে আগেই এগুলোর প্লাগ বিচ্ছিন্ন করা;
১১. বজ্রপাতে কেউ আহত হলে বৈদ্যুতিক শকে আক্রান্তদের মতো প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া এবং দ্রুত চিকিৎসক ডাকা বা হাসপাতালে নেয়া।

বজ্রপাতে ক্ষয়ক্ষতি কমিয়ে আনতে সরকার বহুমুখী প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। ২০১৫ সালে বজ্রপাতকে দুর্যোগ হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে। একে দুর্যোগ হিসেবে গণ্য করে Lightning Detection System অনুসারে সর্বত্র এই কার্যক্রম গ্রহণের জন্য বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরকে অনুরোধ করা হয়েছে। খোলা মাঠে উঁচু জাতের তাল, খেজুর, সুপারি, নারকেল ইত্যাদি গাছ লাগানোর বিষয়ে সরকার বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করেছে। বজ্রপাতে ক্ষতিহ্রাসে করণীয় বিষয়ে লিফলেট তৈরি ও বিতরণ করা হচ্ছে, প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের পাঠ্যবইয়ে এ সংক্রান্ত প্রবন্ধ অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বজ্রপাতের আগাম বার্তা দিতে বিশ্ববিদ্যালয়, গবেষণা প্রতিষ্ঠান ও বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তরে গবেষণা কার্যক্রমের উদ্যোগ গ্রহণের জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। বজ্রপাতে নিহত ব্যক্তির দাফন/ সৎকারের জন্য পরিবার প্রতি ২৫ হাজার টাকা এবং আহত ব্যক্তিকে ১০ হাজার টাকা প্রদান করা হচ্ছে। নিহত ব্যক্তির পরিবারের অস্বচ্ছল ব্যক্তিকে ভিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে।

ঝড়-বৃষ্টির দেশে বজ্রপাত হবে-এটাই স্বাভাবিক। একমাত্র আত্মসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে বজ্রপাতের বিদ্যমান বিপর্যয় থেকে জনজীবন রক্ষা করা সম্ভব হবে। তাই বলতেই হয়-

"বাইরে যদি পড়ে বাজ
ঘরে থাকাই ভাল কাজ"।

#

০৪.০৪.২০১৮ পিআইডি প্রবন্ধ

প্রতিবন্ধিতা ও দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা

মোহাম্মদ ওমর ফারুক দেওয়ান

যে কোনো দুর্যোগে প্রতিবন্ধীরাই সর্বোচ্চ ঝুঁকিতে থাকে। দুর্যোগ যখন প্রকট হয় তখন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে সৃষ্টিকর্তার হাতে ছেড়ে দিয়ে পরিবারের সদস্যদের নিরাপদ স্থানে চলে যাওয়ার উদাহরণ রয়েছে। কিন্তু এ মানুষদেরও কষ্ট আছে, অনুভূতি আছে, আছে বেঁচে থাকার ও সকল নাগরিক সুবিধা পাওয়ার অধিকার। সভ্য সমাজে সুশাসন নিশ্চিত করতে দেশের প্রত্যেকটি নাগরিকের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। তাই দুর্যোগ দুর্বিপাকে এ প্রতিবন্ধী মানুষগুলোর জন্য চাই অগ্রাধিকার সেবা ও নিরাপত্তা।

প্রতিবন্ধীদের অধিকার নিশ্চিত করতে প্রথমেই চাই জনসচেতনতা। প্রতিবন্ধী মানুষেরা এ সমাজেরই অংশ-সাধারণ মানুষের মধ্যে এ অনুভূতিকে জাগিয়ে তুলতে হবে। দুর্যোগকালে তাদের সহায়তা নিশ্চিত করতে প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রম গ্রহণের মাধ্যমে তাদের আচরণগত পরিবর্তন করতে হবে। একজন প্রতিবন্ধী মানুষকে হৃদয়ের চোখ দিয়ে দেখতে হবে। একটু চিন্তা করে দেখলেই আমরা বুঝতে পারবো, এ সমাজে প্রতিবন্ধী মানুষটি কতো অসহায়!

এ উপলব্ধি থেকে সরকার প্রতিবন্ধী মানুষদের জন্য করণীয় সকল পদক্ষেপ গ্রহণে ব্রতী হয়েছে, প্রতিবন্ধী বিষয়ে ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রের আচরণগত পরিবর্তনের জন্য সম্ভাব্য সবধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটিসমূহের ও কর্মকর্তাদের বুনিয়াদি প্রশিক্ষণ মডিউলে প্রতিবন্ধিতা বিষয় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। জেলা পর্যায়ে প্রশিক্ষণ কোর্সটির পাইলটিং করা হয়েছে। মাষ্টার ট্রেইনার পুল হয়েছে, বিভিন্ন ট্রেনিং কোর্সে প্রতিবন্ধিতা বিষয় অন্তর্ভুক্তকরণে একটি পর্যালোচনা কমিটিও হয়েছে। স্থানীয় সরকার বিভাগ উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা ও স্থানীয় জনপ্রতিনিধিদের প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দিচ্ছে। দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনায় ট্রমা ও মানসিক স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সেসাথে মনস্তত্ত্ববিদ, গণমাধ্যম কর্মী ও প্রাথমিক সাড়াদানকারী দলের করণীয় সম্পর্কে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে এবং এ সংক্রান্ত কার্যক্রম চলমান আছে। পুলিশ, অগ্নিনির্বাপক কর্মীসহ সংশ্লিষ্ট আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর জন্য 'দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা নির্দেশিকা' প্রণয়ন করে সকল ইউনিটে পাঠানো হয়েছে। দুর্যোগের কারণে শিশুদের ট্রমা ব্যবস্থাপনায় পরিবারের নারী সদস্যসহ অভিভাবক ও শিশুদের মনস্তাত্ত্বিক এবং মানসিকভাবে সক্ষম করে তুলতে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে।

দুর্যোগকালে প্রতিবন্ধী নারী ও শিশুদেরকে মনোসামাজিক কাউন্সেলিং সেবা প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকায় একটি National Trauma Counseling Centre (NTCC) এবং ঢাকার বাইরে চট্টগ্রাম, সিলেট, রাজশাহী, বরিশাল, ময়মনসিংহ, ফরিদপুর, রংপুর, খুলনা ও দিনাজপুরে ৯ টি Regional Trauma Counseling Centre (RTCC) স্থাপন করা হয়েছে। সম্প্রতি মায়ানমার থেকে আগত বাস্তুচ্যুত নারী ও শিশুদের জন্যও কক্সবাজারে একটি ট্রমা কাউন্সেলিং সেন্টার ও ১০টি ক্যাম্প স্থাপন করা হয়েছে।

দুর্যোগে প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে অগ্রাধিকার সেবা দেওয়ার জন্য চাই আইনি কাঠামো। সরকার সে লক্ষ্যেও কাজ করছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার দলিল 'স্থায়ী আদেশাবলীর' নতুন সংস্করনে প্রতিবন্ধিতা বিষয়ে সুনির্দিষ্ট করণীয় অন্তর্ভুক্ত করা হচ্ছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের আইনি কাঠামো ও নীতিমালাসমূহ পর্যালোচনা করা হচ্ছে। বন্যা ও ঘূর্ণিঝড় আশ্রয় কেন্দ্র, বন্যার ঝুঁকি হ্রাসে ভিটা উচুঁকরণ কার্যক্রমসহ সকল অবকাঠামো প্রতিবন্ধীদের উপযোগী করে নির্মাণ করা হচ্ছে। জাতীয় দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা (২০১৬-২০২০) এ প্রতিবন্ধিতা বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। স্থানীয় সরকারের প্রত্যেক বরাদ্দে ১০ ভাগ অর্থ রাখা হচ্ছে। উপকূলীয় অঞ্চলে কোস্টাল ক্রাইসিস ম্যানেজমেন্ট সেন্টার নির্মাণ করা হয়েছে।

প্রতিবন্ধী জনগোষ্ঠীকে মূলধারায় সম্পৃক্ত করতে, ক্ষমতায়ন ও অধিকার নিশ্চিত করতে চাই সকল ক্ষেত্রে তাদের অংশগ্রহণ। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার জাতীয় কমিটি থেকে ওয়ার্ড কমিটি পর্যন্ত প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের প্রতিনিধি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। এখন তারা নিজেদের কথা বলার প্রাতিষ্ঠানিক প্লাটফরম পেয়েছেন, নিজেদের মতামত রাখতে পারছেন।

সরকার প্রতিবন্ধীবান্ধব দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক জাতীয় টাস্কফোর্স গঠন করেছে যার প্রধান উপদেষ্টা সায়মা হোসেন। মূলত তার উদ্যোগেই প্রতিবন্ধিতাকে দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনার সাথে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে ডাটাবেইজে অন্তর্ভুক্ত করার অংশ হিসেবে ২১ ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত সারাদেশের ১৫,৪১,১৪৯ জন প্রতিবন্ধী ব্যক্তিকে ডাটাবেইজে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। ঘূর্ণিঝড়প্রবণ ১৯টি জেলার প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের আলাদা করে বিস্তারিত তথ্য সংগ্রহ ও ডাটাবেইজ প্রণীত হয়েছে। এ প্রক্রিয়া চলমান আছে। প্রতিবন্ধীদের জন্য এটি একটি বড়ো প্রাতিষ্ঠানিক অগ্রগতি।

বাংলাদেশের নিজস্ব উদ্যোগে প্রতিবন্ধিতা ও দুর্যোগ ঝুঁকি ব্যবস্থাপনা বিষয়ক একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলন ২০১৫ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয় । সম্মেলনে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক ও জেন্ডার সংবেদনশীল প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণ; প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব সীমাবদ্ধ করে এমন বাধাসমূহ সনাক্ত,হ্রাস এবং দূরীকরণের পদক্ষেপ গ্রহণ; সমাজভিত্তিক দুর্যোগ ঝুঁকি নিরূপণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে দুর্যোগ ঝুঁকি প্রশমন কর্মপরিকল্পনা প্রণয়নে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব নিশ্চিতকরণে উদ্যোগ গ্রহণ; জেন্ডার, বয়স ও প্রতিবন্ধিতার শ্রেণিভিত্তিক উপাত্ত বিন্যস্ত করে ডাটাবেইজ তৈরি; বিভিন্ন আপদের পূর্ব সতর্কীকরণ প্রক্রিয়ায় গণমূখী ব্যবস্থার উন্নয়নসহ অনেক যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

জাতিসংঘের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বিষয়ক সংস্থা ঢাকায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনটিকে পরবর্তীতে প্রতিবন্ধিদের নিয়ে আয়োজিত প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন হিসেবে স্বীকৃতি দেয়। আগামী মে মাসে ঢাকাতেই দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক সম্মেলন হওয়ার কথা রয়েছে। নি:সন্দেহে এটা প্রতিবন্ধীদের নিয়ে বাংলাদেশের ভালো কাজের স্বীকৃতি। আমরা চাই প্রতিবন্ধি জনগোষ্ঠী মূলধারায় সম্পৃক্ত হোক, তবেই সম্ভব হবে সার্বজনীন টেকসই দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা।

#

০৪.০৪.২০১৮ পিআইডি প্রবন্ধ

বাংলাদেশের সমৃদ্ধির পথযাত্রা: উন্নয়ন সহযোগীদের পাশে দাঁড়াতে হবে

মোতাহার হোসেন

জাকজমকপূর্ণ আয়োজনের মধ্য দিয়ে গত ২২ মার্চ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশের যোগ্যতা অর্জনের স্বীকৃতি পালন করলো বাংলাদেশ। ঢাকার বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে আয়োজিত অনুষ্ঠান, সারাদেশে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা ও ঢাকার বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামের মনোজ্ঞ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান - সবকিছুতেই ছিল উৎসবের আমেজ। গর্বিত জাতি হিসেবে মাথা উঁচু করে এগিয়ে যাওয়ার দিনটি তো এমনই উৎসবমুখর হওয়ার কথা।

১২ থেকে ১৬ মার্চ অনুষ্ঠিত ইউএনসিডিপি'র (জাতিসংঘের কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি) ত্রিবার্ষিক পর্যালোচনা সভায় বাংলাদেশকে এলডিসি থেকে উত্তরণের যোগ্যতা লাভের স্বীকৃতি দেওয়া হয়। উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় উঠতে হলে একটি দেশের গড় মাথাপিছু আয় হতে হয় ১২৩০ মার্কিন ডলার বা তার বেশি, মানবসম্পদ সূচকে স্কোর করতে হয় ৬৬ বা তারও বেশি এবং অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচকে স্কোর করতে হয় ৩২ বা তার কম। তিনটি সূচকেই বাংলাদেশ নির্ধারিত মান অর্জন করেছে। এলডিসি থেকে উত্তরণের পর বাংলাদেশ আন্তর্জাতিকভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলোর সমকক্ষ হবে। তবে এলডিসি হিসেবে বাংলাদেশ বর্তমানে যেসব সুবিধা ভোগ করে, গ্রাজুয়েশনের পর তা বন্ধ হয়ে যাবে। তবে অর্থনৈতিক গতিশীলতা বৃদ্ধি এবং কার্যক্ষেত্রে যথাযথ প্রস্তুতির মাধ্যমে তা পুষিয়ে নেয়া সম্ভব।

আজ থেকে দুই যুগ, এমনকি এক যুগ আগের বাংলাদেশ, আর আজকের বাংলাদেশ এক অবস্থানে নেই। পরিবর্তন হয়েছে অনেক কিছুই। মানুষের গড় আয়ু, মাথাপিছু গড় আয়, রিজার্ভ, রেমিটেন্স, অর্থনীতির আকার, বাজেটের আকার - সবকিছুতেই এসেছে পরিবর্তন, উন্নতি হয়েছে কয়েক গুন। এক সময়ের তথাকথিত 'তলাবিহীন ঝুড়ি' নামে অপবাদ পাওয়া বাংলাদেশ এখন উপচে পড়া ঝুড়িতে রূপান্তরিত হয়েছে। গত এক দশকে আমাদের গড় জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৬.২৬ শতাংশ। গত অর্থবছরে এ হার ৭.২৮ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। একই সময়ে আমাদের রপ্তানি আয় ও বৈদেশিক রেমিট্যান্সের পরিমাণ তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ প্রায় নয় গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। খাদ্য সংকটের দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য রপ্তানির পথে। অর্থনীতিসহ সামাজিক বহু সূচকে অভাবনীয় সাফল্যে সকলকে অবাক করেছে। জাতিসংঘ, বিশ্বব্যাংক, নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদসহ অনেকেই বিশ্বকে বাংলাদেশ থেকে শিক্ষা নেয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে ছোটো বা বড়ো- কোনো দেশই এককভাবে পথ চলতে পারেনা। তাকে চলতে হয়, প্রতিবেশি বা অন্যদেশ, বন্ধু বা ভ্রাতৃপ্রতীম দেশ এবং বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহকে সঙ্গে নিয়ে। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণে উন্নয়ন সহযোগীদের জোরালো ভূমিকা ছিল। তাই বাংলাদেশের সাফল্যে তারাও খুশী। ভবিষ্যৎ পথচলাতেও তাদের সহযোগিতা প্রয়োজন হবে। জলবায়ু পরিবর্তন ও এ সংক্রান্ত হুমকি মোকাবিলা করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বড়ো চ্যালেঞ্জ হলো অর্থ সরবরাহ নিশ্চিত করা। এজন্য উন্নত দেশগুলোকে আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

বিশ্বের বুকে একটি গতিশীল অর্থনীতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার সকল সম্ভাবনা ও প্রত্যয় আমাদের রয়েছে। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে দেশকে দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হবে। অন্যদিকে উৎপাদনশীলতাকে জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি করে বিনিয়োগের সীমাবদ্ধতাগুলো আংশিকভাবে পুষিয়ে নেয়া যেতে পারে। শিক্ষা ও দক্ষতার সঠিক ব্যবহারের ফলে বিদেশে বাংলাদেশের শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়নসহ রেমিটেন্স বৃদ্ধি পাবে এবং উদ্ভাবনী উদ্যোগকে উৎসাহিত করবে। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনে বাংলাদেশ অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে। সারা দেশে ১৮ হাজার ৫০০ কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করা হয়েছে। জনগণের কাছে স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি মাধ্যম হিসেবে এ উদ্যোগ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে প্রশংসিত হয়েছে।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার কেন্দ্রবিন্দুতে নারীর ক্ষমতায়ন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। জেন্ডার বাজেট প্রণয়নে উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ নেতৃস্থানীয়। টেকসই পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে বাসের সংখ্যা বৃদ্ধিসহ র‍্যাপিড মাস ট্রানজিট, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে এবং রেলভিত্তিক মাস ট্রানজিট সিস্টেম প্রবর্তনের কাজ চলছে। প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের জন্য দেশের বিভিন্ন এলাকায় ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অধিকতর বৈদেশিক বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি ও প্রয়োজনীয় সংস্কার কার্যক্রমও সরকার বাস্তবায়ন করছে।

কৃষিতে জলবায়ু ও দুর্যোগ সংক্রান্ত ঝুঁকি প্রতিরোধ এবং হ্রাস করার জন্য আমরা টেকসই ও উৎপাদনমুখী কৃষি পদ্ধতির ওপর গুরুত্বারোপ করেছি। জলবায়ু সহনীয় খাদ্য উৎপাদন পদ্ধতি, লবণাক্ত পানি এবং বন্যা সহনীয় শস্যাদি উৎপাদনের চেষ্টা করছি। জিডিপির ভিত্তিতে বর্তমানে বাংলাদেশ বিশ্বের ৪৪তম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ আর ক্রয়ক্ষমতার ভিত্তিতে আমাদের অবস্থান ৩২তম। আর্থিক বিশ্লেষকদের মতে ২০৩০ ও ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশ জিডিপি ও ক্রয় ক্ষমতার ভিত্তিতে যথাক্রমে বিশ্বের ২৮ ও ২৩তম অর্থনীতির দেশ হিসেবে স্থান করে নিতে সক্ষম হবে।

গত জানুয়ারিতে বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগীদের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত হয় ২ দিনের বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ফোরাম (বিডিএফ) সম্মেলন। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জগুলো সামনে রেখেই এ বৈঠকে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে সরকারের লক্ষ্য ও কৌশল বিডিএফ নেতাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে এবং এ বিষয়ে তাদের পরামর্শ ও মতামত জানতে চাওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে উন্নয়ন সহযোগী, সুশীল সমাজ, বুদ্ধিজীবী ও বেসরকারি খাতসহ সংশ্লিষ্ট সবার সুচিন্তিত মতামত, পরামর্শ ও সহযোগিতা বাংলাদেশের উন্নয়নকে আরও বেগবান করবে।

#

২৮.০৩.২০১৮ পিআইডি প্রবন্ধ

স্বদেশ ও স্বাধীনতা

মোস্তফা কামাল পাশা

আমরা বাঙালি জাতি। আমাদের জাতিসত্ত্বার বিকাশ হয়েছে হাজার বছর ধরে। এই হাজার বছরের অনেকগুলো বছর ধরে আমরা ছিলাম পরাধীন। একটি জাতি যখন পরাধীন থাকে তখন তার নিজস্ব বলে কিছু থাকে না। আমরাও আমাদের স্বদেশের স্বাধীনতা হারিয়েছি একসময়। সেই স্বাধীনতা পুনরুদ্ধার করতে আমাদের প্রচুর সংগ্রাম করতে হয়েছে। পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে স্বদেশকে মুক্ত করতে চলে গেছে দুই শতাব্দিরও বেশি সময়। স্বাধীনতা ছাড়া স্বদেশের মহিমা উপলব্ধি করা যায় না। মূলতঃ 'স্বদেশ' এবং 'স্বাধীনতা' শব্দ দুটি একে অপরের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে সংশ্লিষ্ট। ব্যক্তি হিসেবে মানুষ জন্মগতভাবে স্বাধীন। কিন্তু এই ব্যক্তিস্বাধীনতা ততক্ষণ পর্যন্ত উপভোগ করা যায় না যতক্ষণ পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা না থাকে।

জাতি হিসেবে আমরা বাঙালি জাতি দুইশত বছর বৃটিশ শাসন আর ২৪ বছর পাকিস্তানি শাসনের কবলে থেকে এই উপলব্ধি করতে পেরেছি বলেই ১৯৭১ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে গর্জে উঠেছিল বাংলার মানুষ। একই ভাষা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে যে জাতির জন্ম হয়েছে আজ থেকে হাজার বছর আগে সেই বাঙালি জাতি সুদীর্ঘকাল ছিল পরাধীনতার নাগপাশে আবদ্ধ। ১৯৪৭ সালে তথাকথিত দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে বৃটিশদের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করলেও প্রকারান্তরে আমরা বাঙালিরা হয়ে গেলাম পাকিস্তানের উপনিবেশ। তারা প্রথম আক্রমণ করলো আমাদের ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর। কারণ তারা বুঝতে পেরেছিল একটি ভাষা ও সংস্কৃতিভিত্তিক জাতিকে ধ্বংস করার জন্য তাদের ভাষা, কৃষ্টি ও সংস্কৃতিকে ধ্বংস করে দেওয়া বাঞ্চনীয়। তারা তাই করতে চেয়েছিল। কিন্তু স্বাধীনতা প্রিয় বাঙালি জাতি সেটি মেনে নেয়নি। আমরা দৃপ্ত কণ্ঠে তার প্রতিবাদ করলাম। আমাদের ভেতরের জাতিসত্ত্বা নড়েচড়ে উঠলো এই প্রথম। ১৯৪৮ সালেই পাকিস্তান গণপরিষদে পূর্ব বাংলার প্রতিনিধি ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দেওয়ার জন্য দাবি উত্থাপন করলেন। পাকিস্তানিরা আমাদের দাবি প্রতিরোধে সমস্ত রাষ্ট্রীয় শক্তি কাজে লাগিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ এক সভায় একমাত্র উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা করলে সেখানে উপস্থিত শেখ মুজিবুর রহমান নামে এক তরুণ প্রথম তীব্র প্রতিবাদ জানালেন। তাঁর সাথে কণ্ঠ মেলালেন হাজারো তরুণ। তীব্র প্রতিবাদে প্রতিরোধে ফেটে পড়ল পুরো বাঙালি জাতি। '৪৮ থেকে '৫২ পর্যন্ত চলতে থাকে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন। '৫২ সালে এসে আন্দোলন তীব্র থেকে তীব্রতর হয়ে উঠে। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালি ছেলেদের বুকের রক্ত ঝড়ে পড়লো রাজপথে। ভাষার জন্য, সংস্কৃতির জন্য প্রাণ দেওয়ার দৃষ্টান্ত স্থাপন হলো এই বিশ্বের বুকে। শুরু হলো স্বদেশ ও স্বাধীনতার দীর্ঘ পথ পরিক্রমা।

এই পথ পরিক্রমায় ধুমকেতুর মতো আবারও আবির্ভূত হলেন শেখ মুজিবুর রহমান। ১৯৬৬ সালে এই মহান নেতা পাকিস্তানি শাসকচক্রের কাছে ঐতিহাসিক ৬ দফা দাবি পেশ করে স্বাধীন স্বদেশের আন্দোলনে এক যুগান্তকারী মাইলফলক স্থাপন করেন। যে ফলক থেকে আমরা শুধু সামনে এগিয়ে গিয়েছি। বঙ্গবন্ধুর সেই ছয় দফার বাস্তবায়ন হলে পাকিস্তানের কোনো অস্তিত্ব থাকে না, থাকতে পারে না, এটা পাকিস্তানিরা বুঝে যায়। কারণ দুই অঞ্চলের জন্য আলাদা মুদ্রা, আলাদা রিজার্ভ ব্যাংক, স্বতন্ত্র প্যারামিলিশিয়া বাহিনী স্থাপন, প্রাদেশিক সরকারের হাতে ট্যাক্স টোল আদায়ের ক্ষমতা প্রদানের দাবি অর্জনের মাধ্যমে বাঙালিরা কী করতে চায় এটা তারা বুঝতে পেরেছিল। তারা বঙ্গবন্ধুকে তাদের ভাষায় বিচ্ছিন্নতাবাদী নেতা হিসেবে সাব্যস্ত করে তাঁর বিরুদ্ধে 'আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা' নামে দেশদ্রোহীতার মামলা করে তাঁকে কারাগারে অন্তরিন করে। প্রবল গণঅভ্যুত্থানের মুখে জেল থেকে বের হয়ে আসেন বঙ্গবন্ধু। তারপর ৭০ সালের নির্বাচন আর একাত্তরের মহান মুক্তিযুদ্ধের গৌরবময় ঘটনার মাধ্যমে পৃথিবীর ইতিহাসে জন্ম নেয় একটি স্বাধীন জাতিরাষ্ট্র।

বিশ্বে বাঙালি জাতির উপলব্ধিতেই প্রথম এসেছে যে, স্বাধীনতাহীনতায় স্বদেশ নেই। পরাধীন দেশ কখনো স্বদেশ হতে পারে না। আমাদের স্বদেশ ছিল, কিন্তু স্বাধীনতা ছিল না। পৃথিবীর কোনো জাতি তার পূর্ণাঙ্গ স্বাধীনতা ছাড়া স্বদেশের মহিমা উপলব্ধি করতে পারে না, করা সম্ভব নয়। স্বদেশের সাথে স্বাধীনতা প্রত্যয়টি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আসলে স্বাধীনতাহীন কোনো ভূখণ্ডকে স্বদেশ বলাও যায় না। বাঙালি জাতি আজ স্বাধীন, বাংলাদেশ বাঙালির স্বদেশ।

#

২২.০৩.২০১৮ পিআইডি প্রবন্ধ

এলডিসি থেকে উত্তরণঃ গর্বিত বাংলাদেশ

এ এম ইমদাদুল ইসলাম

একটি সুখী সমৃদ্ধ সোনার বাংলা গঠনের প্রত্যয়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় স্বাধীন বাংলাদেশ। বাংলাদেশের প্রত্যয়দীপ্ত যাত্রাকে থামিয়ে দিতে স্বাধীনতার মাত্র কয়েকবছরের মাথায় ঘাতকেরা বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করে। সকল প্রতিকূলতা জয় করে জাতির পিতার কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঠিক ও যোগ্য নেতৃত্বে বাংলাদেশ আজ স্বল্পোন্নত দেশ (এলডিসি) থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণের পথে যাত্রা শুরু করেছে। উন্নয়নের অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়ন, ২০৩০ সালের মধ্যে টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জন এবং ২০৪১ সালে প্রধানমন্ত্রীর স্বপ্নের উন্নত দেশের তালিকায় পৌঁছে যাবে বলে সকলেই বিশ্বাস করে।

স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উন্নয়নশীল দেশে উত্তরণ দেশের ইতিহাসে এক অনন্য ঘটনা। জাতিসংঘের অর্থনৈতিক এবং সামাজিক কাউন্সিল (Economic and Social Council-ECOSOC) এর উন্নয়ন নীতিমালা বিষয়ক কমিটি (Committee for Development Policy-CDP) তিনটি সূচকের ভিত্তিতে তিন বছর পরপর উন্নয়নশীল দেশ থেকে উত্তরণের বিষয়টি পর্যালোচনা করে। স্বল্পোন্নত দেশ থেকে বেরিয়ে আসার সূচকগুলো হচ্ছে: (ক) মাথাপিছু আয় (Gross National Income per Capita) যা বিগত তিন বছরের গড় মাথাপিছু জাতীয় আয় থেকে নির্ধারণ করা হয়; (খ) মানবসম্পদ সূচক (Human Assets Index)- যা পুষ্টি, স্বাস্থ্য, মৃত্যুহার, স্কুলে ভর্তি ও শিক্ষার হারের সমন্বয়ে তৈরি হয়; এবং (গ) অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচক (Economic Vulnerability Index) যা প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক আঘাত, জনসংখ্যার পরিমাণসহ আটটি বিষয়ের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়।

উপরের তিনটি সূচকের মধ্যে দুটি সূচকের মান অর্জন করতে পারলেই একটি দেশ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে উত্তরণের যোগ্যতা অর্জন করে। তবে ইচ্ছে করলে কোনো দেশ শুধু মাথাপিছু জাতীয় আয়ের ভিত্তিতেও এলডিসি থেকে বেরিয়ে আসার যোগ্যতা অর্জন করতে পারে। সে ক্ষেত্রে দেশটির মাথাপিছু আয় মূল্যায়নের বছরে নির্ধারিত প্রয়োজনীয় আয়ের দ্বিগুণ হতে হবে। কোনো দেশ পরপর দুটি ত্রিবার্ষিক পর্যালোচনায় (৬ বছর) তিনটি সূচকের যে কোনো দু'টিতে উত্তীর্ণ হলে অথবা জাতীয় মাথাপিছু আয় নির্ধারিত মানের দ্বিগুণ অর্জন করতে পারলে তাকে জাতিসংঘ উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে ঘোষণা দেয়।

জাতিসংঘের তথ্যমতে বর্তমানে বিশ্বের ৪৭টি দেশ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকায় রয়েছে। বাংলাদেশ স্বল্পোন্নত দেশের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয় ১৯৭৫ সালে। ২০১১ তে তুরস্কের ইস্তাম্বুল শহরে অনুষ্ঠিত স্বল্পোন্নত দেশসমূহের ৪র্থ সম্মেলনে স্বল্পোন্নত দেশসমূহের সামগ্রিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ইস্তাম্বুল ঘোষণা ও ইস্তাম্বুল কর্মপরিকল্পনা (Istanbul Programme of Action) গৃহীত হয়। এ কর্মপরিকল্পনার সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হল, ২০২০ সালের মধ্যে অর্ধেক দেশকে স্বল্পোন্নত দেশের ক্যাটগরি থেকে উত্তরণ ঘটানো। এখন পর্যন্ত সর্বমোট পাঁচটি দেশ স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণে সক্ষম হয়েছে। এ দেশগুলো হল- বতসোয়ানা (১৯৯৪), কেপ ভারদে (২০০৭) মালদ্বীপ (২০১১), সামোয়া (২০১৪) ও ইকুয়টরিয়াল গিনি (২০১৭)। এ বছর উত্তরণের যোগ্যতা অর্জন করেছে বাংলাদেশ। এ ছাড়াও এ বছর স্বল্পোন্নত দেশ থেকে উত্তরণের পথে যাত্রা করবে মায়ানমার ও লাওস।

সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশ আর্থসামাজিক উন্নয়নের বিভিন্ন সূচকে ব্যাপক অগ্রগতি অর্জন করেছে। উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় উঠতে হলে একটি দেশের গড় মাথাপিছু আয় হতে হয় ১২৩০ মার্কিন ডলার বা তার বেশি। এক্ষেত্রে CDP'র হিসেবে বাংলাদেশের গড় মাথাপিছু আয় এখন ১২৭২ মার্কিন ডলার। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (বিবিএস) এর হিসেবে তা আরও বেশি, বর্তমান অর্থবছরের হিসেবে ১৬১০ মার্কিন ডলার। উন্নয়নশীল দেশের তালিকায় আসতে হলে একটি দেশকে মানবসম্পদ সূচকে ৬৬ বা তারও বেশি স্কোর করতে হয়। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্কোর ৭২.৮। অন্যদিকে অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা সূচকে যদি কোনো দেশ ৩২ বা তার কম স্কোর করে তাহলে ঐ দেশকে উন্নয়নশীল বলা যাবে। এক্ষেত্রে বাংলাদেশের স্কোর ২৫। যদি বাংলাদেশ আগামী ছয় বছর তিনটি সূচকে অগ্রগতি ধরে রাখতে পারে তাহলে স্বল্পোন্নত দেশের তালিকা থেকে বের হয়ে আসবে।

তবে এলডিসি থেকে উত্তরণ পর্যায়ে ও পরে মোকাবেলা করতে হবে অনেক চ্যালেঞ্জ। মসৃণ উত্তরণের জন্য রপ্তানি বহুমুখীকরণ, মানবসম্পদ উন্নয়ন, রাজস্ব আয় বৃদ্ধি ও বিনিয়োগ বাড়ানোর উদ্যোগ নিতে হবে। বৈশ্বিক বাজারে অবস্থান ধরে রাখা, দক্ষতা উন্নয়ন, দুর্নীতি কমিয়ে সুশাসন নিশ্চিত করাসহ বিভিন্ন বিষয়ে নজর দিতে হবে। এসব উদ্যোগের যথাযথ বাস্তবায়নে নীতির ধারাবাহিকতা ও গণতান্ত্রিক পরিবেশ, বিশেষ করে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ।

এলডিসি থেকে উত্তরণের পরে প্রবৃদ্ধির হার ও বৈদেশিক সাহায্য সূচকে পতন হতে পারে। রেমিট্যান্স কমতে পারে। কর আদায় না বাড়লে আর্থিক ব্যবস্থাপনায় নতুন চাপও সৃষ্টি হবে। উন্নয়নশীল দেশ হলে বৈদেশিক ঋণে রেয়াতি সুদহার থাকবে না। বৈশ্বিক বাজারে শুল্কমুক্ত সুবিধাও কমবে। এ পরিস্থিতি মোকাবেলায় উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে। অন্যদিকে আবহাওয়াগত বিভিন্ন প্রতিকূলতা জয় করার চ্যালেঞ্জও সামনে আসবে। ২০২৪ সাল পর্যন্ত চ্যালেঞ্জ থাকবে। এরপর তা আরও বাড়বে। তবে সম্ভাবনাও রয়েছে প্রচুর। এ বিষয়ে বর্তমান সরকার সচেতন। আশা করা যায় সকল সম্ভাবনা কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে আরো বহুদূর।

#

২২.০৩.২০১৮ পিআইডি প্রবন্ধ

Think of Life, Say No to Drugs

Mohammad Ali Sarker

Bangladesh is marching ahead towards development. The global community, every now and then, refers to Bangladesh while the citing example of rapid and steady development. The country has graduated to the status of a developing country in this month. With this rapid development Bangladesh is encountering a great challenge faced by many countries of the world i.e. drug abuse. It is not only a threat to a single person or a generation as a whole, but also to the progress of the nation.

Bangladesh is not a drug producing country but suffers the negative impact due to the geographical proximity to a number of international drug trafficking routs. Therefore we are at a very high risk and needs proper attention. The adverse affect of drug abuse hit the country mainly in the eighties. From then there seems to be a changing trend of consuming drugs due to new innovations. Heroine emerged in the early eighties, which was diverted to codeine based preparation popularly known as '*Phensedyl'* in the later part of the decade. As the government took stern action against the drug peddlers, the use of those saw a gradual decrease. But a much complex problem is now in the rise. The crazy medicine called *`Amphetamine'*, popularly known as *`Yaba'* has become the drug of automatic choice among the young generation now a days. As *`Yaba'* is cheap, potent and easy to carry- the law enforcing agencies find it more difficult to encounter.

There is a lack of statistical information about the drug abusers of Bangladesh in the government level. However, several studies reflect that there are about 7 million drug abusers in Bangladesh. Among them 70 percent are engaged to many crimes to make money for buying drugs which leads to social unrest.

Another study shows that, about 80 percent of the young generation is addicted to drugs. This obviously depicts a gloomy picture of our future. The peddlers of *`Yaba'* always make propaganda that its use strengthens the body and enable the students to study up to late at night which is totally a false. Rather, regular use of the same decreases the function of the brain that may lead to death. The information of this negative impact must reach the young generation.

The incidence of female drug abusers is also on the rise. Studies show that about 90 percent of the female drug users ranges from the age of 15 to 35 and the rest within 45. They are not only a threat for themselves, but for the issues they are to give birth and the family as a whole.

Dhaka Ahsania Mission (DAM), a non government development organization, made a survey on 103 female drug users who came for treatment in the rehabilitation centers they operate. The survey revealed 43 percent of drug users used *`Yaba'*, 37 percent have taken drugs due to the family unrest while 33 percent were influenced by their friends. Another survey on 263 male drug users by the same organization showed that 41 percent were taking*`Yaba'* and 7 percent *heroin*. It indicated that the use of *Yaba* is rising while *heroin* is reducing. 25 percent of their family members were addicted to drugs earlier, which means they were introduced with drug from the family. Only 14 percent who came for treatment were voluntary and 73 percent were there under family pressure.

The government has taken many initiatives to encounter drug trafficking and drug abuse. The law enforcing agencies are conducting special drives along with their regular operation. Apart from the government, many non government organizations are operating campaign against drugs. Several studies are revealing different facts along with the studies mentioned above. All these facts and recommendations should be put together for an all out drive against drug.

The family is the first and one of the strongest foundations of moral learning. But the family bondage at present is getting fragile. The parents are not paying much attention to their children while expectations from them are growing. This unmatched desire makes the children frustrated and sometime lead to drug addiction. Therefore, family bondage can be a strong obstruction against drug addiction.

There are many rehabilitation centers in the country run by the government as well as the non government organizations. In most of the cases their quality is questionable. This area needs concern. Studies show that in most of the cases, the drug user is forced for treatment in the rehabilitation center rather than their self realization. This situation may leave the rehabilitation process incomplete or collapsed. The drug users must be inspired to feel the essence of life whatever obstruction may come forward.

#

28.03.2018 PID Feature

জীবনকে ভালোবাসুনঃ মাদক থেকে দূরে থাকুন

মো. রিজুয়ান কামাল

বাংলাদেশ দ্রুতগতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। অর্থনীতি, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সামাজিক নিরাপত্তা- সবকিছুতেই বাংলাদেশের উন্নয়ন চোখে পড়ার মত। এদেশে রয়েছে বিপুল সংখ্যক কর্মক্ষম জনশক্তি। এ কর্মক্ষম মানবসম্পদকে কাজে লাগিয়ে ডেমোগ্রাফিক ডিভিডেন্ট আহরণে বাংলাদেশ বেশ সুবিধাজনক অবস্থানে রয়েছে। তবে বিভিন্ন উন্নত দেশের মত বাংলাদেশও বর্তমানে একটি মারাত্মক সমস্যার সম্মুখীন যার নাম মাদকাসক্তি। মাদকাসক্তি ভয়াবহ সামাজিক ব্যাধিরূপে বিস্তার লাভ করেছে। দিনে দিনে বাড়ছে এর তীব্রতা। এর শিকার হয়ে দেশের যুবসমাজের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ মারাত্মক ক্ষতির সম্মুখীন। ফলে নষ্ট হচ্ছে মানবসম্পদ যা দেশের অগ্রযাত্রা ব্যাহত করতে পারে।

বাংলাদেশে কোনো ধরনের মাদক উৎপাদন না হলেও ভৌগোলিক অবস্থানগত দিক থেকে মাদক পাচারের আন্তর্জাতিক কয়েকটি রুটের নিকটবর্তী হওয়ায় আমাদের ঝুঁকি রয়েছে, তাই সচেতনতার প্রয়োজনও অনেক বেশি। আমাদের দেশে বিভিন্ন প্রকারের মাদক দেখা যায়। এগুলোর মধ্যে রয়েছে অ্যালকোহল, ফেনসিডিল, হেরোইন, আফিম ইয়াবা, ইত্যাদি। আশির দশকের শুরুতে হেরোইন ও শেষের দিকে ফেনসিডিল এর মাধ্যমে আমাদের দেশে মাদকাসক্তি দ্রুত বিস্তার লাভ করে। সরকারের কড়া নজরদারি এবং কঠোর অবস্থানের কারণে এ দুই প্রকারের মাদকের ব্যবহার অনেক কমে আসলেও নতুন সমস্যা তৈরি করেছে ইয়াবা। সস্তা ও সহজে বহনযোগ্য হওয়ায় এর বিস্তার রোধ করতে বেগ পেতে হচ্ছে আমাদের।

আমাদের দেশে মাদকাসক্তদের বিষয়ে সরকারিভাবে কোনো পরিসংখ্যান না থাকলেও ধারনা করা হয় দেশে প্রায় ৭০ লক্ষ মাদকাসক্ত রয়েছে। মাদকাসক্তদের মধ্যে ৫০ শতাংশই বিভিন্ন অপরাধে জড়িত। বিভিন্ন সামাজিক গবেষণায় দেখা গেছে, নেশার প্রয়োজনে টাকা জোগাড় করতে এমন কোনো কাজ নেই যা মাদকাসক্তরা করে না। নিজের রক্ত বিক্রি থেকে শুরু করে চুরি-ডাকাতি, ছিনতাই, সন্ত্রাসসহ নানারকম অপরাধে জড়িত থাকায় সামাজিক অস্থিরতাও বাড়ছে দিনদিন। এই প্রবণতা রোধ করা জরুরি।

আরেক গবেষণায় দেখা গেছে দেশে মাদকাসক্তদের ৮০ শতাংশই যুবক। বাংলাদেশের ভবিষ্যত বিবেচনায় নিঃসন্দেহে এ পরিসংখ্যান ইতিবাচক নয়। ইয়াবার ব্যবহার বাড়াতে মাদক ব্যবসায়ীরা অপপ্রচার চালায় যে, ইয়াবার ব্যবহারে শরীরে অনেক বল আসে, রাত জেগে পড়া যায়, দুর্বলতা কেটে যায়। এ অপপ্রচারে বিভ্রান্ত হয়ে যুবক ও শিক্ষার্থীরা ইয়াবার প্রতি আসক্ত হয়। অথচ এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা ও বানোয়াট। নিয়মিত ইয়াবা ব্যবহারে মস্তিস্কের কার্যক্ষমতা কমে যায় এবং ধীরে ধীরে তা মৃত্যুর দিকে নিয়ে যায়। এ বিষয়টি যুবসমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন।

আমাদের দেশে নারী মাদকাসক্তদের সংখ্যাও বাড়ছে। বিভিন্ন গবেষণা বলছে নারী আসক্তদের মধ্যে ৯০ শতাংশের বয়স ১৫ থেকে ৩৫ বছর, বাকীদের বয়স ৪৫ এর মধ্যে। এসব মাদকাসক্তদের মাধ্যমে তাদের সন্তানরাও মাদকের প্রতি আকৃষ্ট হতে পারে যা পারিবারিক পর্যায়ে নৈরাজ্য সৃষ্টি করবে।

বেসরকারি সংগঠন ঢাকা আহসানিয়া মিশন তাদের পরিচালিত নিরাময় কেন্দ্রে আসা ১০৩ জন নারীর মধ্যে জরিপ চালিয়ে জানতে পারে যে, নারী মাদকাসক্তদের মধ্যে ৪৩ শতাংশই ইয়াবায় আসক্ত। আসক্তদের মধ্যে ৩৭ শতাংশ জানায় পারিবারিক অশান্তি থেকে দূরে থাকতে তারা মাদকের প্রতি আকৃষ্ট হয়েছে, ৩৩ শতাংশ জানায় বন্ধুদের মাধ্যমে তারা নেশায় জড়িয়ে পড়েছে। ঢাকা আহসানিয়া মিশন পরিচালিত নিরাময় কেন্দ্রে আসা ২৬৩ জন পুরুষ মাদকাসক্তের ওপর পরিচালিত আরেকটি জরীপে দেখা যায় মাদকাসক্তদের মধ্যে ৪১ শতাংশই ইয়াবায় আসক্ত এবং ইয়াবা গ্রহণের প্রবণতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২৫ শতাংশ জানায় পরিবারের অন্য সদস্যদের মাধ্যমে তারা মাদকাসক্ত হয়েছে। নিজের উদ্যোগে চিকিৎসা নিতে আসা মাদকাসক্তের সংখ্যা মাত্র ১৪ শতাংশ।

মাদকের বিস্তার রোধে সরকারের বিভিন্ন উদ্যোগ রয়েছে। প্রায় প্রতিদিন দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মাদকের চোরাচালানের সময় ধরা পড়ছে বিপুল পরিমাণ মাদকদ্রব্য। সরকারিসহ বিভিন্ন বেসরকারি সংগঠনের উদ্যোগে পরিচালিত হচ্ছে মাদকবিরোধী অভিযান। ওপরে দেওয়া তথ্যগুলো ছাড়াও উঠে আসছে নানা রকমের তথ্য উপাত্ত। এসব বিশ্লেষণ করে সুনির্দিষ্ট কর্মপরিকল্পনা নিয়ে সবাইকে একযোগে মাদকের বিরুদ্ধে নামতে হবে।

পরিবার হচ্ছে নৈতিক শিক্ষার প্রথম ও শক্তিশালী ধাপ। কিন্তু আমাদের দেশের পারিবারিক বন্ধন শিথিল হয়ে পড়ছে। মা-বাবা সন্তানদের জন্য পর্যাপ্ত সময় দিচ্ছেন না বা দিতে পারছেন না। সন্তানদের সক্ষমতার কথা বিবেচনা না করে অসম প্রতিযোগিতার দিকে ঠেলে দেওয়ার ফলে তারা হতাশাগ্রস্ত হয়ে নিজেরা অথবা বন্ধুদের মাধ্যমে মাদকের নেশায় জড়িয়ে পড়ছে। তাই পারিবারিক বন্ধন দৃঢ় করতে হবে, সন্তানদের পর্যাপ্ত সময় দিতে হবে, তারা কাদের সাথে মেশে সে বিষয়ে খোঁজ রাখতে হবে।

মাদকাসক্তদের জন্য সরকারের পাশাপাশি বিভিন্ন বেসরকারি সংগঠন মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র পরিচালনা করছে। বেশিরভাগ নিরাময় কেন্দ্রের চিকিৎসার মান নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে। তাছাড়া সমীক্ষায় দেখা গেছে নিরাময় কেন্দ্রে চিকিৎসা নিতে আসা অধিকাংশ মাদকাসক্ত পরিবারের চাপে পরে চিকিৎসা নিতে আসে, নিজের উপলব্ধি থেকে নয়। ফলে দীর্ঘমেয়াদি চিকিসা অসম্পূর্ণ বা ব্যর্থ হতে পারে। এ বিষয়েও আমাদের নজর দিতে হবে। মাদকাসক্তদের বোঝাতে হবে জীবন একটাই, একে ভালোবাসতে হবে। মাদক থেকে দূরে থাকতে হবে।

সরকার নানাভাবে মাদক ও এ সংক্রান্ত সামাজিক অপরাধ নির্মূলে আপ্রাণ চেষ্টা করছে। মাদকের বিস্তার রোধে জনসচেতনতা গড়ে তুলতে ১ মার্চ থেকে সারাদেশে 'জীবনকে ভালোবাসুন মাদক থেকে দূরে থাকুন' স্লোগান নিয়ে মাদকবিরোধী তথ্য অভিযান শুরু হয়েছে। একটি সুন্দর আগামীর জন্য এ প্রচারাভিযানে যার যার অবস্থানে থেকে আমরা অংশ নিতে পারি।

#

১৫.০৩.২০১৮ পিআইডি প্রবন্ধ

পাটের সোনালি দিন

মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন

২০০১ সালে যুক্তরাষ্ট্রের পরিবেশ সংরক্ষণ বিষয়ক দপ্তর জানায়, বিশ্বব্যাপী প্রতি মিনিটে প্রায় ১ মিলিয়ন পলিথিন ব্যাগ ব্যবহার হয়। এটি মাটির মধ্যে অবস্থান করে অক্সিজেন ও পানির প্রবাহকে ব্যাহত করে। পোড়ানো হলে এর বিষাক্ত ধোঁয়া বায়ু দূষণ করে, সমুদ্রে পড়লে আরও অনেক বেশি ক্ষতি করে। এর ভয়াবহতা বুঝতে পেরে ২০০৩ থেকে এই পর্যন্ত আফ্রিকা, এশিয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় দেশ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া, ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্রসহ আরো অনেক দেশে প্লাস্টিক ব্যাগ ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয়েছে। বাংলাদেশও ২০০২ সাল থেকে পলিথিন ব্যাগের ব্যবহার নিষিদ্ধ করেছে। তখন থেকেই বিকল্প হিসেবে প্রথম পছন্দ হিসেবে চলে আসে পরিবেশবান্ধব "পাট"। সত্তুর এর দশকে পাটতন্তুর বিকল্প হিসেবে প্লাস্টিক ও পলিথিন আত্মপ্রকাশ করার ফলে পাটের যে দুর্দিন আসে তা পেছনে ফেলে আবারও ফিরে আসতে থাকে পাটের সোনালি দিন।

এ দেশের ভূমি এবং জলবায়ু পাটচাষের উপযোগী বলে ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দের মধ্যে এ অঞ্চলের পাটশিল্প সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫১ সালে নারায়নগঞ্জ শহরের শীতলক্ষ্যার তীরে ২৯৭ একর জমির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় পৃথিবীর বৃহত্তম আদমজী জুট মিল্স। এটি ছিল তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানের ২য় পাটকল (প্রথমটি হল বাওয়ানী পাটকল)। এর আগে সমস্ত পাট রপ্তানি হত বিদেশের বাজারে। পরবর্তীতে মূলত ষাট ও সত্তরের দশকে দেশে অসংখ্য পাটকল স্থাপিত হয়। আদমজী পাটকলে উৎপাদিত হত চট, কার্পেটসহ বিভিন্ন প্রকার পাটজাত দ্রব্য।

বাংলাদেশের প্রায় ৪ কোটি মানুষ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পাটখাতের সাথে জড়িত। সম্প্রতি দেশের পাট রপ্তানির পরিমাণ বাড়তে শুরু করেছে। বিশ্বে পাটপণ্য ব্যবহারের ৭৫ ভাগই প্যাকেজিং আইটেম। তাই পাটের বহুমুখী ব্যবহার ধরে রাখতে নতুন ও ভিন্নধর্মী পণ্য আবিষ্কারের চেষ্টা অব্যাহত আছে। নতুন পণ্য তালিকায় আছে জুট প্লাস্টিক, দেয়াল আবরণী, বৃহদাকার ব্যাগ, চা-ব্যাগ, জিও-জুট, কম্বল, জুতো-স্যান্ডেল, স্কুল ব্যাগ, ব্রিফকেস, হ্যাট-টুপি ইত্যাদি। বর্তমানে বাংলাদেশ থেকে প্রতিমাসে ১ লক্ষ পাটের ব্যাগ রপ্তানি করা হয়। সম্প্রতি পাট ও পাটজাত বর্জ্যের সেলুলোজ থেকে পরিবেশবান্ধব পলিব্যাগ উদ্ভাবন করেছে পরমাণু শক্তি কমিশন, যা দুই থেকে তিন মাসের মধ্যেই মাটিতে মিশে যাবে। ফলে পরিবেশের ক্ষতি হবে না।

সরকারের উদ্যোগের অংশ হিসেবে আগামীতে পাট থেকে তৈরি হবে ডেনিম গার্মেন্টস, ট্রাউজার, কোট, ব্লেজার, শার্ট, পর্দার কাপড়, ডোর মেট, হোম টেক্সটাইল ও বিভিন্ন ধরনের ব্যাগ। নতুন প্রযুক্তির মাধ্যমে ৫০ শতাংশ পাট ও ৫০ শতাংশ তুলা ব্যবহার করে তৈরি করা সুতা দিয়ে পরিবেশবান্ধব এসব পণ্য উৎপাদন করা সম্ভব। এজন্য বাংলাদেশ পাটকল করপোরেশন (বিজেএমসি)-এর নিয়ন্ত্রণাধীন জুট মিলে বহুমুখী পাটপণ্য উৎপাদনের জন্য পৃথক ইউনিট স্থাপনের প্রকল্প নিয়েছে সরকার।

সরকারি পাটকলগুলোকে আধুনিকায়নের লক্ষ্যে সরকার নতুন কর্মকর্তা-কর্মচারী নিয়োগ, মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে যুগোপযুগী প্রশিক্ষণ ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার অব্যাহত আছে। বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণে প্রথমবারের মতো "বিজেএমসি" ২০১০-১১ অর্থবছরে ১৯ দশমিক ৫২ কোটি টাকা লাভ করে। পণ্যে পাটজাত মোড়কের ব্যবহার বাধ্যতামূলক আইন-২০১০ পুরোপুরি বাস্তবায়ন করা গেলে দেশে বার্ষিক পাটের ব্যাগের চাহিদা ৯০ হাজার পিস থেকে বেড়ে ৮৪ কোটি পিসে উন্নীত হবে।

পরিবেশ সচেতনার কারণে বিশ্ববাজারে পাট ও পাটজাত পণ্যের চাহিদা ও দাম বৃদ্ধি পাওয়ায় কৃষকরা নতুন করে পাট চাষে আগ্রহী হয়ে উঠছেন। বাংলাদেশের বিজ্ঞানীরা পাটের জিনকোড আবিষ্কারের কৃতিত্বও দেখিয়েছেন। ২০১০ সালে তোষা পাটের জীবনরহস্য (জিনোম সিকোয়েন্স) আবিস্কার, ২০১২ সালে পাটের কাণ্ড পঁচা রোগ প্রতিরোধী পাটজাত উদ্ভাবনের নিমিত্তে পাটসহ পাঁচ শতাধিক উদ্ভিদের জন্য ক্ষতিকারক ছত্রাক *Macrophomina phaseolina* এর জীবনরহস্য উন্মোচন এবং ২০১৩ সালে দেশি পাটের জীবনরহস্য আবিষ্কারের সাফল্য দেখিয়েছে বাংলাদেশ। পাটের আঁশের মান, দৈর্ঘ্য ও রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতার জন্য দায়ী চারটি জিনের পেটেন্ট (কৃতিত্ব) পেয়েছে বাংলাদেশ। এর মধ্য দিয়ে পাটের নতুন যুগে প্রবেশ করল বাংলাদেশ। এছাড়া *Macrophomina phaseolina* এর তিনটি জিন শনাক্ত করে সেগুলোর পেটেন্টও পেয়েছে বাংলাদেশ।

জীবনরহস্যের তথ্যকে কাজে লাগিয়ে বর্তমানে স্বল্প জীবনকাল সমৃদ্ধ, প্রতিকূল পরিবেশ, রোগবালাই ও পোকামাকড় সহনশীল, চাহিদা মাফিক পণ্য উৎপাদন উপযোগী কম লিগনিন সমৃদ্ধ উচ্চ ফলনশীল পাটের জাত উদ্ভাবনের গবেষণা এগিয়ে চলছে। বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করছেন পাটের মধ্যে এমন বৈশিষ্ট্য যুক্ত করতে, দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বাজারে যার চাহিদা রয়েছে। কম লিগনিন সমৃদ্ধ জাত উদ্ভাবন সম্ভব হলে বস্ত্র শিল্পে তুলার বিকল্প হিসেবে অথবা তুলার সাথে সংমিশ্রণে পাটের ব্যবহারে প্রভূত উন্নতি সাধিত হবে।

পাট ও পাটপণ্য শুধু পরিবেশবান্ধব এবং সহজে পচনশীলই নয়, এটি পরিবেশে বিরাট অবদান রাখে এবং দেশের কৃষি ও বাণিজ্যের ভারসাম্য রক্ষা করে। ধারণা করা হচ্ছে, পাট ও পাটজাত পণ্যের ব্যবহার আগামী দুই থেকে তিন বছরের মধ্যেই সারা বিশ্বে তিনগুণ বেড়ে যাবে। এসব সম্ভাবনাকে সামনে রেখেই ৬ মার্চ দেশে পালিত হয়েছে জাতীয় পাট দিবস। পরিবেশ ভাবনা এবং দেশের উন্নতমানের পাটকে কাজে লাগিয়ে অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি অর্জন- এ দুই হাতিয়ার কাজে লাগাতে পারলে পাট চাষের হারানো সোনালি দিন ফিরে আসবে, সমৃদ্ধ হবে সোনার বাংলা।

#

১৫.০৩.২০১৮ পিআইডি প্রবন্ধ

বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশনঃ সমুদ্রপথে পণ্য পরিবহণে পথিকৃৎ

মো. জাহাঙ্গীর আলম খান

জাতিসংঘ ঘোষিত 'সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' অর্জনে বাংলাদেশ যেমন অগ্রনী ভূমিকা পালন করেছিল 'টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা' অর্জনে বাংলাদেশ তেমন ভূমিকা পালন করতে চায়। সাম্প্রতিককালে সমুদ্র অর্থনীতি বা ব্লু ইকোনমি ভিত্তিক উন্নয়নের যে ধারণা প্রচলিত হয়েছে বাংলাদেশের সে সুযোগ গ্রহণের উজ্জ্বল সম্ভাবনা রয়েছে। বিশেষ করে নৌ-বাণিজ্য এবং নৌপথের ব্যবহারের মাধ্যমে দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহে পর্যটনের অফুরন্ত সম্ভাবনা রয়েছে। মালদ্বীপ, শ্রীলঙ্কা ও বাংলাদেশ হয়ে থাইল্যান্ড, মালয়েশিয়া ও সিঙ্গাপুর পর্যন্ত ক্রুজ শিপ পরিচালনা করে ভবিষ্যতে পর্যটন শিল্পের বিকাশ হতে পারে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারে বাংলাদেশ শিপিং কর্পোরেশন (BSC)।

আন্তর্জাতিক নৌপথে নিরাপদ ও দক্ষ শিপিং সেবা প্রদান করে দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন সাধন এবং আন্তর্জাতিক নৌবাণিজ্যের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে দেশের বৈদেশিক বাণিজ্যের যাবতীয় কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে ১৯৭২ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি BSC প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ভারত সরকারের ঋণ সহায়তায় ১৯৭২ সালে সর্বপ্রথম 'বাংলার দূত' এবং ১৯৭৩ সালে 'বাংলার সম্পদ' জাহাজ দিয়ে BSC এর জাহাজ বহরের সূচনা হয়। বঙ্গবন্ধুর আমলে সংগৃহীত জাহাজের মধ্যে বাংলার স্বপ্ন, বাংলার উপহার, বাংলার তরণী, বাংলার আশা, বাংলার মৈত্রী উল্লেখযোগ্য। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে এ যাবৎ BSC ৩৮টি জাহাজ সংগ্রহ করে। মেয়াদোত্তীর্ণ এবং বাণিজ্যিকভাবে অলাভজনক বিবেচিত হওয়ায় ৩৫টি জাহাজ বিক্রয় করার পর বর্তমানে BSC বহরে মাত্র তিনটি জাহাজ রয়েছে। এরমধ্যে একটি কনটেইনারবাহী জাহাজ এবং দু'টি লাইটারেজ জাহাজ ট্যাংকার।

দেশের চাহিদা অনুযায়ী অতি প্রয়োজনীয়, গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল জ্বালানি তেল পরিবহণের জন্য বিদেশি জাহাজের ওপর নির্ভরশীলতা পরিহার করে নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি সরবরাহ সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকার জ্বালানি তেল পরিবহণের সার্বিক দায়িত্ব BSC 'র ওপর ন্যস্ত করে। সে অনুযায়ী BSC দীর্ঘদিন যাবৎ নিজস্ব এবং ভাড়া করা জাহাজের মাধ্যমে উক্ত দায়িত্ব সফলতার সাথে পালন করে আসছে। বর্তমানে BSC বছরে আনুমানিক ১৩ লক্ষ মেট্রিক টন ক্রুড অয়েল পরিবহণ ছাড়াও নিজস্ব এবং ভাড়া করা জাহাজের মাধ্যমে বাণিজ্যিক পণ্য পরিবহণসহ রাষ্ট্রীয় জরুরি পরিস্থিতিতে সরকারি পণ্য (সার, গম) পরিবহণে নিয়োজিত রয়েছে।

দেশের সামগ্রিক উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় BSC'র উন্নয়নেও নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। এরই অংশ হিসেবে জাহাজ অর্জন ও অবকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য গত ২০১১-২০১২ অর্থবছরে রিপিট পাবলিক অফারিং (RPO) এর মাধ্যমে শেয়ারবাজার হতে ৩১৩.৭০ কোটি টাকা সংগ্রহ করা হয়েছে। RPO তহবিলের অর্থ দিয়ে BSC'র ঢাকাস্থ নিজস্ব জমিতে 'BSC টাওয়ার' নামে তিনটি বেজমেন্টসহ ২৫ তলাবিশিষ্ট আধুনিক সুযোগ-সুবিধা সম্বলিত একটি অত্যাধুনিক বাণিজ্যিক ভবন নির্মাণকাজ সম্পন্ন হয়েছে এবং একটি নতুন প্রডাক্ট অয়েল/ কেমিক্যাল, ক্রুড অয়েল ট্যাংকার ক্রয়ের কার্যক্রম বর্তমানে চলমান রয়েছে। তাছাড়া জাহাজ অর্জনের অংশ হিসেবে চীন সরকারের লোনের অধীনে BSC'র জন্য ৬টি নতুন জাহাজ (৩টি প্রডাক্ট অয়েল ট্যাংকার এবং ৩টি বাল্ক ক্যারিয়ার) সংগ্রহের কার্যক্রম চলছে যা আসন্ন জুন ২০১৮ নাগাদ BSC বহরে সংযুক্ত হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

দেশের মোট আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্যে সরকারি খাতে পরিবহণ ক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে ব্যবসায়িক চাহিদা এবং সরকারের রূপকল্প ২০২১ ও ৭ম পঞ্চম বার্ষিকী পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে আগামী ২০২১ সাল নাগাদ BSC'র জন্য বিভিন্ন প্রকার ও সাইজের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক জাহাজ সংগ্রহের পরিকল্পনা রয়েছে।

নিজস্ব অর্থায়নে কমপক্ষে ৩৪,০০০ ডেড ওয়েট টন (DWT) সম্পন্ন একটি নতুন প্রোডাক্ট/ কেমিক্যাল, ক্রুড অয়েল ট্যাংকার ২৮৬ কোটি টাকায় ক্রয়ের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। বৈদেশিক ঋণ সহায়তায় বিভিন্ন ধরনের ২৪টি জাহাজ ক্রয়ের লক্ষ্যে সমঝোতা স্মারকপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে।

২০০৮ ও পরবর্তী সময়ে বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক মন্দা ও জাহাজ ভাড়া সব রেকর্ড ভঙ্গ করে সর্বনিম্ন পর্যায়ে হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও পুরাতন জাহাজবহরের মাধ্যমে BSC বাণিজ্যিক কার্যক্রম পরিচালনা করে যাচ্ছে। সরকারিভাবে প্রথমবারের মতো দেশের চাল রপ্তানির সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রেক্ষিতে BSC ২০১৪ সালে শ্রীলঙ্কায় প্রায় ২৫ হাজার মেট্রিক টন চাল পরিবহণ করে।

মেরিটাইম সেক্টরে নারীদের অংশগ্রহণ নিশ্চিতকল্পে ও নারীর ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে BSC তথা বাংলাদেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো ২০১৪ সাল হতে এ পর্যন্ত বাংলাদেশ মেরিন একাডেমির ৩৫ জন মহিলা ক্যাডেটকে BSC'র বিভিন্ন জাহাজে প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য নিয়োগ দেওয়া হয়েছে। নৌ-বাণিজ্যের পাশাপাশি কর্মসংস্থান সৃষ্টিতেও BSC'র উল্লেখযোগ্য অবদান রয়েছে।

বিশ্বের মোট পণ্য পরিবহণ ব্যবস্থায় সমুদ্রপথে পণ্য পরিবহণের অবদান প্রায় ৯০ শতাংশ। বাংলাদেশও তার ব্যতিক্রম নয়। জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির সাথে সাথে বিশ্বব্যাপী আমদানি-রপ্তানি বাণিজ্য উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে। এরই ধারাবহিকতায় শিপিং সেক্টরেও নতুন নতুন নৌ-রুটে জাহাজ চলাচলের ব্যাপ্তি ঘটছে। ভৌগোলিক প্রেক্ষাপটে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া অঞ্চলে জাহাজ পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে BSC সম্ভাবনাময় অবস্থানে রয়েছে।

এশিয়া মহাদেশের এ অঞ্চলে মিয়ানমার, থাইল্যান্ড, ভারত, ভিয়েতনাম ও কম্বোডিয়াসহ অন্যান্য দেশসমূহ ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড হাতে নেওয়ায় পৃথিবীর বিখ্যাত জাহাজ পরিচালনাকারী প্রতিষ্ঠানগুলো এ অঞ্চলের নৌ-বাণিজ্যে বিশেষ আগ্রহী হয়ে উঠেছে। সে প্রেক্ষিতে বাণিজ্যিক সুযোগ এবং কৌশলী সিদ্ধান্ত কাজে লাগিয়ে এ অঞ্চলের শিপিং সেক্টরে BSC অধিকতর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করতে পারে।

#

২২.০২.২০১৮ পিআইডি প্রবন্ধ

বাংলাদেশের সমৃদ্ধির পথযাত্রা: উন্নয়ন সহযোগীদের পাশে দাঁড়াতে হবে

মোতাহার হোসেন

সম্প্রতি ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়ে গেল বাংলাদেশের উন্নয়ন সহযোগীদের অংশগ্রহণে ৩ দিনের বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ফোরাম (বিডিএফ) সম্মেলন। মূলত: দেশের উন্নয়ন, অবকাঠামো, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, স্যানিটেশনসহ বিভিন্ন খাতে অর্থায়নকারী আন্তর্জাতিক দাতা ও সহযোগী সংস্থাসমূহের সাথে সরকারের নীতি নির্ধারকদের আলোচনার জন্যই এই সম্মেলন। সরকারের তথা দেশের চাহিদা অনুযায়ী ভবিষ্যৎ উন্নয়ন কর্মসূচি বাস্তবায়নে কতটুকু আর্থিক সহায়তা প্রয়োজন এবং বিগত সময়ে বিভিন্ন ধরনের আর্থিক সহায়তায় বাস্তবায়িত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের অগ্রগতি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয় এই ফোরামে।

আজ থেকে দুই যুগ, এমনকি এক যুগ আগের বাংলাদেশ, আর আজকের বাংলাদেশ এক অবস্থানে নেই। পরিবর্তন হয়েছে অনেক কিছুই। মানুষের গড় আয়ু, মাথাপিছু গড় আয়, রিজার্ভ, রেমিটেন্স, অর্থনীতির আকার, বাজেটের আকার - সব কিছুতেই এসেছে পরিবর্তন, উন্নতি হয়েছে কয়েক গুন। এক সময়ের তথাকথিত 'তলাবিহীন ঝুড়ি' নামে অপবাদ পাওয়া বাংলাদেশ এখন উপচে পড়া ঝুড়িতে রূপান্তরিত হয়েছে। গত এক দশকে আমাদের গড় জিডিপি প্রবৃদ্ধির হার ছিল ৬.২৬ শতাংশ। গত অর্থবছরে এ হার ৭.২৮ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। একই সময়ে আমাদের রপ্তানি আয় ও বৈদেশিক রেমিট্যান্সের পরিমাণ তিন গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ প্রায় নয় গুণ বৃদ্ধি পেয়ে ৩৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলারে পৌঁছেছে। খাদ্য সংকটের দেশ আজ খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণতা অর্জন করে উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য রপ্তানির পথে। অর্থনীতিসহ সামাজিক বহু সূচকে অভাবনীয় সাফল্যে সকলকে অবাক করেছে। জাতিসংঘ, বিশ্বব্যাংক, নোবেল বিজয়ী অর্থনীতিবিদসহ অনেকেই বিশ্বকে বাংলাদেশ থেকে শিক্ষা নেয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

বর্তমান বিশ্বায়নের যুগে ছোটো বা বড়ো- কোনো দেশই এককভাবে পথ চলতে পারেনা। তাকে চলতে হয়, প্রতিবেশি বা অন্যদেশ, বন্ধু বা ভ্রাতৃপ্রতীম দেশ এবং বিভিন্ন উন্নয়ন সহযোগী সংস্থাসমূহকে সঙ্গে নিয়ে। আর সে কারণেই বাংলাদেশের উন্নয়নের এ পথযাত্রায় পাশে দাঁড়ানোর জন্য উন্নত দেশগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। জলবায়ু পরিবর্তন ও এ সংক্রান্ত হুমকি মোকাবিলা করে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের বড়ো চ্যালেঞ্জ হলো অর্থ সরবরাহ নিশ্চিত করা। এজন্য উন্নত দেশগুলোকে আর্থিক ও কারিগরি সহযোগিতা নিয়ে এগিয়ে আসতে হবে।

এ বছরের মার্চে ইউএনসিডিপি'র (জাতিসংঘের কমিটি ফর ডেভেলপমেন্ট পলিসি) ত্রিবার্ষিক পর্যালোচনা সভায় বাংলাদেশ প্রথমবারের মতো এলডিসি থেকে উত্তরণের যোগ্যতা লাভ করবে। এলডিসি থেকে উত্তরণের পর বাংলাদেশ আন্তর্জাতিকভাবে উন্নয়নশীল দেশগুলোর সমকক্ষ হবে। তবে এলডিসি হিসাবে বাংলাদেশ বর্তমানে যেসব সুবিধা ভোগ করে, গ্রাজুয়েশনের পর তা বন্ধ হয়ে যাবে। তবে অর্থনৈতিক গতিশীলতা বৃদ্ধি এবং কার্যক্ষেত্রে যথাযথ প্রস্তুতির মাধ্যমে তা পুষিয়ে নেয়া সম্ভব।

বিশ্বের বুকে একটি গতিশীল অর্থনীতি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করার সকল সম্ভাবনা ও প্রত্যয় আমাদের রয়েছে। বাংলাদেশ উন্নয়ন ফোরামের এ বৈঠক দারিদ্র্য ও ক্ষুধামুক্ত সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ বিনির্মাণের জন্য যৌথ কর্মপন্থা নির্ধারণ ও প্রয়োজনীয় সুপারিশ প্রণয়নে গুরুপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে দেশকে দ্রুত প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে হবে। অন্যদিকে উৎপাদনশীলতাকে জ্যামিতিক হারে বৃদ্ধি করে বিনিয়োগের সীমাবদ্ধতাগুলো আংশিকভাবে পুষিয়ে নেয়া যেতে পারে। শিক্ষা ও দক্ষতার সঠিক ব্যবহারের ফলে বিদেশে বাংলাদেশের শ্রমিকদের দক্ষতা উন্নয়নসহ রেমিটেন্স বৃদ্ধি পাবে এবং উদ্ভাবনী উদ্যোগকে উৎসাহিত করবে। স্বাস্থ্য সম্পর্কিত সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি) অর্জনে বাংলাদেশ অসাধারণ সাফল্য অর্জন করেছে। সারা দেশে ১৮ হাজার ৫০০ কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপন করা হয়েছে। জনগণের কাছে স্বাস্থ্যসেবা নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি মাধ্যম হিসেবে এ উদ্যোগ আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে প্রশংসিত হয়েছে।

সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা এবং টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রার কেন্দ্রবিন্দুতে নারীর ক্ষমতায়ন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। জেন্ডার বাজেট প্রণয়নে উন্নয়নশীল দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ নেতৃস্থানীয়। টেকসই পরিবহণ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে বাসের সংখ্যা বৃদ্ধিসহ র‍্যাপিড মাস ট্রানজিট, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়ে এবং রেলভিত্তিক মাস ট্রানজিট সিস্টেম প্রবর্তনের কাজ চলছে। প্রত্যক্ষ বৈদেশিক বিনিয়োগের জন্য দেশের বিভিন্ন এলাকায় ১০০টি অর্থনৈতিক অঞ্চল প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে অধিকতর বৈদেশিক বিনিয়োগবান্ধব পরিবেশ সৃষ্টি ও প্রয়োজনীয় সংস্কার কার্যক্রমও সরকার বাস্তবায়ন করছে।

কৃষিতে জলবায়ু ও দুর্যোগ সংক্রান্ত ঝুঁকি প্রতিরোধ এবং হ্রাস করার জন্য আমরা টেকসই ও উৎপাদনমুখী কৃষি পদ্ধতির ওপর গুরুত্বারোপ করেছি। জলবায়ু সহনীয় খাদ্য উৎপাদন পদ্ধতি, লবণাক্ত পানি এবং বন্যা সহনীয় শস্যাদি উৎপাদনের চেষ্টা করছি। জিডিপির ভিত্তিতে বর্তমানে বাংলাদেশ বিশ্বের ৪৪তম বৃহত্তম অর্থনীতির দেশ আর ক্রয়ক্ষমতার ভিত্তিতে আমাদের অবস্থান ৩২তম। আর্থিক বিশ্লেষকদের মতে ২০৩০ ও ২০৫০ সাল নাগাদ বাংলাদেশ জিডিপি ও ক্রয় ক্ষমতার ভিত্তিতে যথাক্রমে বিশ্বের ২৮ ও ২৩তম অর্থনীতির দেশ হিসেবে স্থান করে নিতে সক্ষম হবে।

দেশকে সমৃদ্ধির পথে এগিয়ে নিতে রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়নে কাজ করছে সরকার। রূপকল্প-২০২১ এর লক্ষ্য হচ্ছে বাংলাদেশকে একটি মধ্যম আয়ের দেশে রূপান্তর করা। ৭ম, ৮ম ও ৯ম - এ তিনটি পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার মাধ্যমে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্য ২০৩০ বাস্তবায়ন করা একান্ত জরুরি। সদ্য সমাপ্ত বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ফোরামে বৈঠকে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ বাস্তবায়নে সরকারের লক্ষ্য ও কৌশল বিডিএফ নেতাদের সামনে তুলে ধরা হয়েছে এবং এ বিষয়ে তাদের পরামর্শ ও মতামত জানতে চাওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে উন্নয়ন সহযোগী, সুশীল সমাজ, বুদ্ধিজীবী ও বেসরকারি খাতসহ সংশ্লিষ্ট সবার সুচিন্তিত মতামত, পরামর্শ ও সহযোগিতা বাংলাদেশের উন্নয়নকে আরও বেগবান করবে।

#

২২.০২.২০১৮ পিআইডি প্রবন্ধ

পায়রা বিদ্যুৎকেন্দ্র : দক্ষিণাঞ্চলের উন্নয়নে আনবে বিপ্লব

মোহাম্মদ গিয়াস উদ্দিন

বিশ্ব অর্থনীতিতে উদীয়মান শক্তি বাংলাদেশ। এ দেশের আর্থ-সামাজিক ও জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়নে বিদ্যুৎ অপরিহার্য। শিল্প, কলকারখানা, কৃষিকাজ, মানবসম্পদ উন্নয়ন, আধুনিক জীবনযাত্রা, চিকিৎসা, যোগাযোগ, কম্পিউটার প্রযুক্তির ব্যবহার থেকে শুরু করে উন্নয়নের প্রায় সব ক্ষেত্রেই প্রয়োজন বিদ্যুৎ। দারিদ্র্য বিমোচন করে বাংলাদেশকে শিল্পোন্নত দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে বিদ্যুতের গুণগত মান ও প্রাপ্যতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। এ উপলব্ধি থেকে বিদ্যুৎ খাতের কাঙ্ক্ষিত উন্নয়ন ও পরিচালনায় দক্ষতা বৃদ্ধি ও উন্নত গ্রাহক সেবার প্রতি সরকার গুরুত্বারোপ করেছে। বাংলাদেশ বিদ্যুতের উৎপাদনই শুধু বৃদ্ধি করেনি এখন পরিবেশবান্ধব বিদ্যুতের দিকে অগ্রসর হচ্ছে।

নবাব আহসানউল্লাহর সময় ঢাকার রাস্তায় প্রথম বিদ্যুতের বাতি জ্বলে। ১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসকরা চলে যাওয়ার সময় বাংলাদেশের বিদ্যুৎ ব্যবস্থাটি ছিল ১৭টি প্রাদেশিক রাজ্যে সীমিত আকারে। সর্বমোট উৎপাদনক্ষমতা ছিল সর্বোচ্চ ১৭ মে.ও.। পাবলিক সেক্টরে প্রথম বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপিত হয় ১৯৬০ সালে সিদ্ধিরগঞ্জে (স্টীম টারবাইন)। পরবর্তীতে সরকারের সময়াবদ্ধ এবং সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার ফলে একে একে আরও বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপিত হয়। বর্তমানে দেশের বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ১৬,০৪৬ মেগাওয়াট, মাথাপিছু বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ৪৩৩ কিলোওয়াট।

রূপকল্প ২০২১ এর আওতায় সবার জন্য সাশ্রয়ী মূল্যে মানসম্মত বিদ্যুৎ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে বিদ্যুৎখাতের মহাপরিকল্পনা প্রণয়ন, সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় বিদ্যুৎখাতের ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনাসহ বিভিন্ন পরিকল্পনার বাস্তবায়ন চলমান রয়েছে। ইতোমধ্যেই দেশের ৮৩ শতাংশ জনগোষ্ঠী বিদ্যুৎ সুবিধার আওতায় এসেছে। অবশিষ্ট ১৭ শতাংশ আগামী ২০২১ সালের মধ্যেই বিদ্যুৎ সুবিধা পাবে বলে আশা করা যায়। এর মধ্যে জাতীয় গ্রীডের আওতায় প্রায় ৯০ শতাংশ জনগোষ্ঠী বিদ্যুৎ সুবিধা ভোগ করবে। অবশিষ্ট ১০ শতাংশ জনগোষ্ঠী বিশেষ করে দ্বীপাঞ্চল ও চরাঞ্চলের জনগণ সৌর বিদ্যুতের আওতায় আসবে।

বিদ্যুৎ খাতের উন্নয়ন মহাপরিকল্পনা অনুযায়ী সাশ্রয়ী কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র স্থাপনের ওপর গুরুত্ব দিয়ে সরকার দক্ষিণাঞ্চলের মানুষের বিদ্যুতের চাহিদা মেটাতে পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার ধানখালী ইউনিয়নের মধুপাড়া, নিশানবাড়িয়া ও চরনিশান বাড়িয়ার ১০০২ একর জায়গা জুড়ে পায়রায় পায়রা বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণ করছে। এখানে ১৩২০ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক, ১০০ মেগাওয়াট সৌর এবং ৫০ মেগাওয়াট বায়ুবিদ্যুৎ নির্মাণ কাজ চলমান। এখানে গড়ে উঠছে দেশের সর্ববৃহৎ জ্বালানি কেন্দ্র বা এনার্জি হাব। দেশে যতগুলো কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র রয়েছে তারমধ্যে সবচেয়ে বেশি এগিয়ে পায়রা বিদ্যুৎকেন্দ্র।

ধানখালী ইউনিয়নের দুই পাশে রয়েছে জেলার গলাচিপা উপজেলা ও বরগুনা জেলার আমতলী উপজেলা। ৪৮ বর্গমাইল আয়তনের ১৪টি গ্রামের এই ইউনিয়নের মোট লোকসংখ্যা প্রায় ২২ হাজার এবং শিক্ষার হার ৫৯ শতাংশ। ৯৬ হাজার কোটি টাকা ব্যয়ে বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তির, সম্পূর্ণ পরিবেশবান্ধব কয়লাচালিত বিদ্যুৎকেন্দ্রের কাজ চলছে এই এলাকায়। পরিবেশ-প্রতিবেশ, জনস্বাস্থ্য এবং সমুদ্র উপকূলভাগের ওপর কোনোরকম বিরূপ প্রভাব যাতে না পড়ে সেটি নিশ্চিত রেখেই উন্নততর আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল প্রযুক্তির সমন্বয়ে কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রটি স্থাপন করা হচ্ছে।

ইতোমধ্যে পায়রা বিদ্যুৎকেন্দ্র প্রকল্পের ৩১ শতাংশ কাজ শেষ হয়েছে। ২০১৯ সালে কয়লাভিত্তিক এ বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকেই নয় হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে। এখান থেকে বিদ্যুৎ জাতীয় গ্রিডের সাথে যুক্ত করা হবে। এজন্য পটুয়াখালী থেকে গোপালগঞ্জ পর্যন্ত পরিকল্পনাধীন ১৬০ কিলোমিটার ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইনটি গোপালগঞ্জের ৪০০/১৩২ কেভি গ্রিড উপকেন্দ্রের মাধ্যমে মঙ্গলা-আমিনবাজার ৪০০ কেভি সঞ্চালন লাইনের সাথে যুক্ত হবে।

এই বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে সাশ্রয়ীমূল্যে বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে। চরের মানুষের জীবন বদলে দিতে সেখানে বিদ্যুৎ সংযোগ, রাস্তা নির্মাণ, অভ্যন্তরীণ সকল রাস্তায় বৈদ্যুতিক বাতির ব্যবস্থা করা হচ্ছে। গড়ে তোলা হচ্ছে কমিউনিটি ক্লিনিক, মসজিদ, ঈদগাঁহ, অফিস কাম-কমিউনিটি সেন্টার। শিশুদের জন্য থাকবে খেলার মাঠ, প্রকল্পের ক্ষতিগ্রস্ত পরিবারের শিশুদের জন্য পাশেই থাকবে স্কুল ও সাঁতার শেখার জন্য পুকুর। বেকার সমস্যা বা কর্মসংস্থানের সমস্যা দুর হবে।

পদ্মা সেতু ও পায়রা বিদ্যুৎ কেন্দ্র নির্মাণের সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়ে পড়া দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলে ব্যাপক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে। এতে এই এলাকায় অন্তত ১২ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুতের চাহিদা তৈরি হবে। এই প্রকল্প হয়ে গেলে সময় সাশ্রয়ের কারণে শিল্পোদ্যোক্তা এবং ব্যবসায়ীরা বরিশালে তাদের কার্যক্রম সম্প্রসারণ করতে পারবে। আগামী ৫ থেকে ১০ বছরের মধ্যে দক্ষিণাঞ্চল হবে বাণিজ্য এবং পর্যটনসমৃদ্ধ একটি উন্নত শিল্প অঞ্চল। দক্ষিণাঞ্চলের উৎপাদিত ধান, মাছ সবজি, ফল সব দ্রুততার সাথে দেশের বিভিন্ন প্রান্তে এমনকি বিদেশে রপ্তানি করতে পারবে । দক্ষিণাঞ্চলের কৃষি ও শিল্প বিপ্লবের ফলে এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটবে ব্যাপক হারে।

খাদ্য নিরাপত্তার বিষয়টি সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিধায় বর্তমান সরকার গত বছরগুলোতে সেচ কাজে নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের ব্যবস্থা করেছে। ফলে খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে এবং হাজার হাজার কোটি টাকার বৈদেশিক মুদ্রার সাশ্রয় হয়েছে। শিল্প ও ম্যানুফ্যাকচারিং খাতেও উল্লিখিত সময়ে আশানুরূপ প্রবৃদ্ধি হয়েছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের বিকাশে বিপুল পরিমাণ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। পোশাক শিল্পসহ রপ্তানিমুখী শিল্পে লোডশেডিং সীমিত রেখে বিদ্যুৎ সরবরাহের ফলে এ খাতের ক্রমাগত প্রবৃদ্ধি জাতীয় অর্থনীতিকে শক্তিশালী করেছে।

নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহই সরকারের 'রূপকল্প-২০২১' বাস্তবায়ন করবে। পায়রা বিদ্যুৎকেন্দ্রর সুফল দক্ষিণাঞ্চলের কৃষি ও শিল্প বিপ্লবের মাধ্যমেই সর্বত্র দৃশ্যমান হবে। দেশ এগিয়ে যাবে। দেশের সামগ্রিক উন্নয়ন, দারিদ্র্য বিমোচন ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধিতে আসবে কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি। এভাবেই ২০৪১ এ ৬০ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদনের মধ্যদিয়ে বাংলাদেশ প্রবেশ করবে উন্নত রাষ্ট্রের মর্যাদায়।

#

১৩.০২.২০১৮ পিআইডি প্রবন্ধ

সবার আগে শিশুর অধিকার

মো. মঈনউদ্দীন

শিশুর অধিকার বিষয়টি অত্যন্ত ব্যাপক। পুরো বিশ্বেই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হচ্ছে। আমাদের দেশও এর ব্যতিক্রম নয়। কোনো দেশের উন্নয়নে সরকার বিভিন্ন সময়ে পরিকল্পনা হাতে নেয়। শিশুরা জাতির ভবিষ্যৎ, তাই তাদের অধিকার আদায় না করে উন্নয়ন সম্ভব নয়।

আজকের শিশু আগামীর ভবিষ্যৎ- একথা মোটামুটি আমাদের সবারই জানা। কিন্তু শিশুর বিকাশ যদি বাধাগ্রস্ত হয়, তারা যদি তাদের পূর্ণ অধিকার নিয়ে যোগ্য নাগরিক হিসেবে বেড়ে উঠতে না পারে, তাহলে আগামীদিনের নেতৃত্ব দিতে পারবে কী-না তা নিয়ে আশঙ্কা থেকেই যায়। বর্তমান সরকার বাংলাদেশকে ২০২১ সালের মধ্যে মধ্য আয়ের এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত রাষ্ট্রে পরিণত করার লক্ষ্য স্থির করেছে। সেই উন্নত রাষ্ট্রের নেতৃত্ব দিতে হবে নতুন প্রজন্মকেই। তাই একটি শিশুকে যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে হলে প্রথমেই শিশুর পারিবারিক ও সামাজিক অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। বাংলাদেশে বর্তমানে প্রচলিত আইন অনুসারে ১৮ বছরের নীচে সকলেই শিশু হিসেবে স্বীকৃত।

বিশ্বব্যাপী শিশুর অধিকার সংরক্ষণের জন্য ১৯২৪ সালে জেনেভায় এক আন্তর্জাতিক সম্মেলনের মাধ্যমে 'শিশু অধিকার' ঘোষণা করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৫৯ সালে জাতিসংঘে 'শিশু অধিকার সনদ' ঘোষণা করা হয় এবং এর ৩০ বছর পর ১৯৮৯ সালে এই সনদ গৃহীত হয়। শিশু অধিকার সনদে স্বাক্ষরকারী প্রথমসারির দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। ১৯৯০ সালে বাংলাদেশ এই সনদে স্বাক্ষর করে।

আন্তর্জাতিক শিশু অধিকার সনদে মোট ৫৪টি ধারা রয়েছে। এই সনদে প্রতিটি শিশুর প্রতি অত্যাচার, অবহেলা, শোষণ থেকে সুরক্ষা পাবার অধিকার নিশ্চিত করার কথা বলা হয়েছে। এই সনদ অনুসারে প্রতিটি শিশু নাম ও জাতীয়তা লাভের অধিকারী। প্রতিটি শিশুর রয়েছে স্বাধীন চিন্তা, মুক্ত মতামত প্রকাশের ও তথ্য লাভের অধিকার। মাতাপিতা/ অভিভাবকহীন শিশু দত্তক ব্যবস্থার মাধ্যমে পুনর্বাসনের অধিকারী। মানসিক ও শারীরিক প্রতিবন্ধী, শরণার্থী এবং সংখ্যালঘু শিশুদের অন্যান্য শিশুদের মতো সমান অধিকার রয়েছে। প্রতিটি শিশু সামাজিক নিরাপত্তা লাভের অধিকারী। প্রতিটি শিশু বিনামূল্যে প্রাথমিক ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা লাভের অধিকারী। প্রতিটি শিশুর রয়েছে অপহরণ, বিক্রি বা পাচার থেকে রক্ষা পাবার অধিকার। এছাড়া অপরাধী শিশুরা মৃত্যুদণ্ড, যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা যে-কোনো বড়ো ধরনের শাস্তি থেকে মুক্ত থাকার অধিকারী।

শিশু অধিকার সুরক্ষায় বাংলাদেশ সরকার অত্যন্ত আন্তরিক। বাংলাদেশের সর্বোচ্চ আইন সংবিধানে রাষ্ট্রীয় নীতির মৌলাদর্শ বর্ণনায় শিশু অধিকারের প্রাসঙ্গিক বিধান এবং মৌলিক অধিকারসমূহ সংরক্ষিত রয়েছে। সংবিধানের ২৭, ২৮ ও ৩১ অনুচ্ছেদে সব ধরনের বৈষম্য থেকে শিশুর নিরাপত্তা বিধানের সাধারণ নীতিমালার উল্লেখ রয়েছে। সংবিধানের এসব অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে যে, আইনের দৃষ্টিতে সকল নাগরিক সমান ও অভিন্ন নিরাপত্তা লাভের অধিকারী বিধায় পক্ষপাতহীনভাবে তাদের আইনের সুযোগ লাভের অধিকারও রয়েছে।

শিশুদের সার্বিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে এবং অধিকার প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশ সরকার নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। প্রণীত হয়েছে শিশু আইন ১৯৭৪। বর্তমান সরকার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বাধাসমূহ দুর করে একটি সমতাভিত্তিক রাষ্ট্র বিনির্মাণে ঘোষণা করেছে ভিশন ২০২১। এই লক্ষ্য সামনে রেখে সব শিশুকে আগামী দিনের যোগ্য নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে প্রণয়ন করেছে জাতীয় শিশু সুরক্ষা নীতিমালা ২০১০। এটি শিশুদের বর্তমান ও ভবিষ্যৎ বিনির্মাণে সুদূরপ্রসারী রূপকল্প। এছাড়াও শিশু অধিকার রক্ষায় বর্তমান সরকার প্রণয়ন করেছে পারিবারিক সহিংসতা আইন ২০১০, জাতীয় শিশু শ্রম নীতিমালা ২০১০, বাংলাদেশ জাতীয় শিশু নীতি ২০১১ এবং শিশু অধিকার আইন ২০১৩।

শিশু অধিকার রক্ষায় বাংলাদেশ সরকারের অর্জন ঈর্ষনীয়। এক্ষেত্রে সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বা এমডিজির অর্জন অগ্রগণ্য। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সাফল্য কেবল দক্ষিণ এশিয়াতেই নয়, সারাবিশ্বে প্রশংসিত হয়েছে। বলা হয়, বাংলাদেশ এমডিজি অর্জনের রোল মডেল। এমডিজির অনেকগুলো লক্ষ্য ছিল শিশু সুরক্ষার ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক। এমডিজি-২ অর্থাৎ সমতার ভিত্তিতে শিক্ষার সুযোগ সৃষ্টির ক্ষেত্রে বাংলাদেশ প্রসংশনীয় অগ্রগতি অর্জন করেছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার বেড়ে ৯৮ শতাংশে উন্নতি হয়েছে। বর্তমান সরকার দেশের সবগুলো প্রাথমিক বিদ্যালয়কে সরকারিকরণ করেছেন। দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত শিক্ষা অবৈতনিক করা হয়েছে। ২০১০ সাল থেকে বছরের প্রথম দিনে বিনা মূল্যে ৩৫০ মিলিয়নের অধিক বই শিশুদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে যা শিশুদের জন্য বর্তমান সরকারের এক চকমপ্রদ উপহার। বিদ্যালয়ে সরকারিভাবে দুপুরের খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এতে ঝরে পড়ার হার অনেক কমে এসেছে।

এমডিজি-৪ এ ছিল শিশু মৃত্যুহার হ্রাসকরণ। বাংলাদেশ ৭২ শতাংশ শিশু মৃত্যুর হার রোধে সক্ষম হয়েছে। এজন্য ২০১২ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘের এমডিজি-৪ পুরস্কার অর্জন করে। সারাদেশে ১৩ হাজার ৮০০টি কমিউনিটি ক্লিনিক স্থাপনের মাধ্যমে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে মাতৃমৃত্যু হার ও শিশুমৃত্যু হার হ্রাসে কাজ করেছে সরকার। তাই বাংলাদেশের এমডিজির ক্ষেত্রে এই অভাবনীয় অর্জন শিশুদের সার্বিক সুরক্ষায় একটি ইতিবাচক অগ্রগতি। শিশু অধিকারের অন্যতম অন্তরায় দারিদ্র্য দূরীকরণে বাংলাদেশ শুধু সফলই হয়নি, ১৯৯১ সালে ৫৭.৬ শতাংশ থেকে তা ২০১৫ তে ২৪.৪ শতাংশ-এ নামিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। এমডিজি অর্জনের ক্ষেত্রে অকল্পনীয় সাফল্য অর্জনের স্বীকৃতিস্বরূপ ২০১৫ এ জাতিসংঘের সম্মানজনক Champions of the Earth পুরস্কারে ভূষিত হন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এমডিজি)'র মেয়াদ শেষে ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাতিসংঘের উদ্যোগে সকল মানুষের জন্য ২০৩০ সালের মধ্যে একটি অধিকতর টেকসই ও সুন্দর বিশ্ব গড়ার প্রত্যয় নিয়ে সার্বজনীনভাবে টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা এসডিজি গৃহীত হয়। বাংলাদেশ সরকার সপ্তম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনায় এবং ২০১৬-১৭ অর্থবছর থেকে বার্ষিক বাজেটে এসডিজিকে সম্পৃক্ত করেছে। সেখানে শিশু অধিকার ও শিশু সুরক্ষার বিষয়টিকে অত্যন্ত গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

এসডিজি-২(ক্ষুধামুক্তি) এর আলোকে অনূর্ধ্ব পাঁচ বছর বয়সি শিশুদের বিকাশের বাধাসমূহ ৩৬.১ শতাংশ থেকে ২৫ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্যস্থির করেছে সরকার। এসডিজি-৩ (সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ) এর আলোকে অনূর্ধ্ব পাঁচ বছর বয়সি শিশু মৃত্যুর হার প্রতি হাজারে ৪১ থেকে ৩৪ নামিয়ে আনা হবে। এসডিজি-৪ (মানসম্মত শিক্ষা) এর আলোকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরের ছাত্রছাত্রী ভর্তির হার ১০০ শতাংশ নিশ্চিতকরণ, প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিতকরণ এবং শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনীর হার বর্তমানে ৮০ থেকে ১০০ শতাংশে উন্নীতকরণের পরিকল্পনা করেছে সরকার।

শিশু অধিকার নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সামনে কিছু চ্যালেঞ্জ রয়েছে। এক্ষেত্রে সবচেয়ে বড়ো চ্যালেঞ্জ হচ্ছে শিশুশ্রম নিরসন। সম্প্রতি বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো (BBS) পরিচালিত এক জরিপ থেকে দেখা যায়, ১৭ লক্ষ শিশু শ্রমে নিয়োজিত যাদের মধ্যে প্রায় ১৩ লক্ষ শিশু অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রমে জড়িত। দারিদ্র্য ও প্রাকৃতিক দুর্যোগ, মাতা-পিতার বেকারত্ব, অসুস্থতা, মৃত্যু, বহুবিবাহ ইত্যাদি শিশুদেরকে শিশুশ্রমে নিয়োজিত হতে বাধ্য করছে। ফলশ্রুতিতে শিশুরা তাদের অধিকার এবং মৌলিক চাহিদা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। তাদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশ তো বাধাগ্রস্ত হচ্ছেই, পাশাপাশি তারা মাদকাসক্তি ও অন্যান্য অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত হয়ে পড়ে। তাদের বাল্যবিবাহ ও পাচারের ঝুঁকি বেড়ে যায়। তারা অপরিণত বয়সে দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়।

বর্তমান সরকার শিশুশ্রম নিরসনে নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় গার্মেন্টস শিল্পে শিশুশ্রম শূন্যের কোঠায় নেমে এসেছে। বাংলাদেশ শিশুশ্রম আইন ২০০৬ এবং জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতিমালা ২০১০ অনুযায়ী ৩৮ প্রকার শ্রমকে অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে এবং এ ধরনের কাজে শিশু কিশোরদের নিয়োগ রহিত করা হয়েছে। বর্তমান সরকার ২০২১ সালের মধ্যে এদেশ থেকে সকল প্রকার ঝুঁকিপূর্ণ শিশুশ্রম নিরসন এবং ২০২৫ সালের মধ্যে সব ধরনের শিশুশ্রম বন্ধে বদ্ধপরিকর। এজন্য সরকার ৮৭৫ কোটি ৫৭ লক্ষ টাকা ব্যয়ে শিশুশ্রম নিরসন প্রকল্প গ্রহণ করেছে। শিশুশ্রম নিরসনে মাতাপিতার জীবিকা উন্নয়নে সহায়তা করার পাশাপাশি শিশুবান্ধব পরিবার ও সমাজ গঠনে সচেতনতা বৃদ্ধির ওপর জোর দিচ্ছে বর্তমান সরকার।

শিশুরা জাতি গঠনের মূল ভিত্তি। দেশপ্রেমিক ও কর্মক্ষম ভবিষ্যৎ প্রজন্ম গড়ে তুলতে শিশুর অধিকার নিশ্চিত করার কোনো বিকল্প নেই। বাংলাদেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন কৌশল আজ তৃতীয় বিশ্বের বহু দেশের জন্য মডেল। আজকে যে শিশু বা কিশোর, আগামী দিনে সেই হবে এ উন্নয়ন কৌশলের মূল চালিকাশক্তি। এই শিশু কিশোরদের আধুনিক সমাজের উপযোগী করে গড়ে তুলতে শিশুর অধিকার নিশ্চিত করতে হবে সর্বাগ্রে।

#

১৩.০২.২০১৮ পিআইডি প্রবন্ধ

বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠনে বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ

মো: কামরুল ইসলাম ভূইয়া

শিক্ষা জাতির মেরুদণ্ড। পাশাপাশি একটা জাতির উন্নতির সোপানও হলো শিক্ষা। মেধা ও মননে আধুনিক এবং চিন্তা-চেতনায় অগ্রসর একটি সুশিক্ষিত জাতিই একটি দেশকে উন্নতির শিখরে পৌঁছে দিতে পারে। সে জন্য সকলের জন্য মানসম্মত, আধুনিক ও যুগোপযোগী শিক্ষা, কম্পিউটারসহ আধুনিক প্রযুক্তি ও তথ্য-প্রযুক্তিভিত্তিক শিক্ষালাভ নিশ্চিতকরণ এবং তার প্রয়োগ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের সংবিধানে শিক্ষাকে মৌলিক প্রয়োজন হিসেবে গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে (ধারা ১৫)। একই পদ্ধতির গণমুখী ও সার্বজনীন শিক্ষাব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা এবং নির্দিষ্ট স্তর পর্যন্ত সকল বালক বালিকাকে অবৈতনিক ও বাধ্যতামূলক শিক্ষার জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের কথা বলা আছে (ধারা ১৭)।

বর্তমান সরকার নিরক্ষরতা দূর করে সকলের জন্য শিক্ষা নিশ্চিত করার পাশাপাশি উচ্চশিক্ষাকে বিশ্বমানে উন্নীত করার জন্য নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহের মধ্যে শিক্ষাসহায়তা কার্যক্রম অন্যতম। 'শিক্ষা নিয়ে গড়ব দেশ, শেখ হাসিনার বাংলাদেশ' এ স্লোগান নিয়ে এগিয়ে চলেছে শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম। অর্থের অভাবে শিক্ষার সুযোগবঞ্চিত দরিদ্র, মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষা নিশ্চিত এবং স্নাতকোত্তর পর্যায়ে উচ্চতর গবেষণার জন্য ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান করার লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা ট্রাস্ট ২০১২ ইতোমধ্যে গঠন করা হয়েছে। ৬ষ্ঠ থেকে স্নাতক ও সমমান শ্রেণি পর্যন্ত দরিদ্র, মেধাবী ছাত্রছাত্রীদের বিনা বেতনে শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ সৃষ্টি ও উপবৃত্তি প্রদান, স্নাতকোত্তর পর্যায়ে উচ্চতর গবেষণার জন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. ফিল বা পিএইচডি কোর্সে নিবন্ধিত বা গবেষণায় নিয়োজিত গবেষককে ফেলোশিপ ও বৃত্তি প্রদান এবং শিক্ষার্থী ঝরে পড়া রোধসহ সকল পর্যায়ে শিক্ষার গুণগতমান নিশ্চিত করা এ ট্রাস্টের উদ্দেশ্য।

বিনামূল্যে বই বিতরণ, উপবৃত্তি প্রদান, শিক্ষাক্ষেত্রে ডিজিটালাইজেশন, সৃজনশীল মেধা অন্বেষণ, সৃজনশীল প্রশ্ন পদ্ধতির প্রবর্তন, পাঠ্যাভ্যাস উন্নয়ন কর্মসূচি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে মেধার ভিত্তিতে কেন্দ্রীয়ভাবে শিক্ষক নিয়োগ, পেশাগত দক্ষতা উন্নয়নে দেশ-বিদেশে প্রশিক্ষণ, কারিগরি ও উচ্চশিক্ষার প্রসার এবং গুণগতমান বৃদ্ধি, স্কুল ফিডিং কর্মসূচি, শিক্ষাক্ষেত্রে অবকাঠামো উন্নয়ন, আধুনিক ও সময়োপযোগী কারিক্যুলাম প্রণয়ন, মাদ্রাসা শিক্ষার আধুনিকায়ন প্রভৃতি কার্যক্রম সফলভাবে বাস্তবায়িত হচ্ছে প্রধানমন্ত্রীর শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রমের আওতায়।

বর্তমান যুগ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির। উন্নত দেশগুলোতে তো বটেই, আমাদের সমাজের সাধারণ মানুষের জীবনে সকল ক্ষেত্রেই বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও তথ্যপ্রযুক্তি জ্ঞান এবং এগুলোর প্রয়োগ হয়ে পড়েছে একান্ত অপরিহার্য। সে জন্য বিজ্ঞানমনস্ক জাতি গঠন, বিজ্ঞান সংক্রান্ত গবেষণার উন্নয়ন ও ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রত্যয়ে বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট আইন ২০১৬ প্রণীত হয়েছে। এ আইনের মাধ্যমে বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট নামে একটি ট্রাস্ট গঠন করা হয়েছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিষয়ে দেশ-বিদেশে মাস্টার্স বা সমতুল্য ডিগ্রি, পিএইচডি, পোস্ট ডক্টরাল গবেষণা বা অধ্যয়নের জন্য ট্রাস্টি বোর্ড নির্ধারিত পদ্ধতিতে ফেলোশিপ প্রদান করা; বিজ্ঞান এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষায়িত যোগ্যতাসম্পন্ন বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদ, গবেষক ও একাডেমিশিয়ান তৈরির লক্ষ্যে মাস্টার্স বা সমতুল্য ডিগ্রি, পিএইচডি ও পোস্ট ডক্টরাল পর্যায়ে গবেষণা কার্যক্রমে সহায়তা প্রদান করা; দেশ ও বিদেশে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়সমূহে মাস্টার্স, পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের মাধ্যমে গবেষকদের গবেষণা ও উন্নয়ন বিষয়ে অধিকতর দক্ষতা অর্জনের সুযোগ সৃষ্টি করা; দেশে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় সহায়ক কার্যক্রম পরিচালনা করা এবং প্রশিক্ষিত বিজ্ঞানীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে দেশের উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে গবেষণা ও উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করাই ট্রাস্টের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য।

ট্রাস্ট গঠনের আগে এটি 'বঙ্গবন্ধু ফেলোশিপ অন সাইন্স এন্ড আইসিটি' নামে একটি প্রকল্প ছিল। জুলাই ২০১০ থেকে ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত মেয়াদে এ প্রকল্পের আওতায় বিদেশে ৫০ জন মাস্টার্স, ৬০ জন পিএইচডি এবং দেশে ১০০ জন পিএইচডি ও ১১ জন পিএইচডি উত্তর গবেষণায় ফেলোশিপ প্রদানের জন্য নির্বাচন করা হয়েছে। বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ট্রাস্ট গঠনের পর এর আওতায় এবার ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে বিদেশে ২১ জন মাস্টার্স, ৩৭ জন পিএইচডি এবং দেশে ৫০ জন পিএইচডি ও ০৮ জন পিএইচডি উত্তর গবেষণায় ফেলোশিপ প্রদানের জন্য প্রাথমিকভাবে নির্বাচন করা হয়েছে। এ ট্রাস্টের আওতায় নির্বাচিত ফেলোদের পড়াশুনার সব ধরনের খরচ প্রদান করা হয়। নির্বাচিত ফেলোগণকে লিভিং এলাউন্স হিসেবে বিদেশে (ইউরোপ ও জাপানে) মাসিক ৯৬,০০০ টাকা ও এশিয়ার অন্যান্য দেশে মাসিক ৫০,০০০ টাকা এবং দেশে মাসিক ১৫,০০০ টাকা, বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্ধারিত রেটে টিউশন ফি; বই-পুস্তক ক্রয়বাবদ বিদেশে এককালীন ৪০,০০০ টাকা এবং দেশে ৩৫,০০০ টাকা; থিসিস ফি হিসেবে বিদেশে এককালীন ৫০,০০০ টাকা (পিএইচডি), ৩০,০০০ টাকা (মাস্টার্স) এবং দেশে ২৫,০০০ টাকা; এবং বিদেশে অধ্যয়নরত ফেলোদের প্রকৃত বিমান ভাড়া ও ভিসা ফি প্রদান করা হয়। বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনিয়র অধ্যাপক, সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি ও জাতীয় পর্যায়ের গবেষণা প্রতিষ্ঠানসমূহের নির্বাহীগণের সমন্বয়ে গঠিত বিশেষজ্ঞ কমিটি ফেলো নির্বাচন করে। কোর্স সম্পন্নকারী গবেষকগণ দেশে নতুন নতুন প্রযুক্তি ও পদ্ধতি উদ্ভাবনে গবেষণা ও উচ্চ শিক্ষাক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রাখতে সক্ষম হচ্ছেন।

বঙ্গবন্ধু বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ফেলোশিপ ছাড়াও বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রণালয় উচ্চশিক্ষার জন্য জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি (NST) ফেলোশিপ প্রদান করে আসছে। পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়,গবেষণা প্রতিষ্ঠানে অধ্যয়নরত বা গবেষণারত মাস্টার্স, এমফিল, পিএইচডি এবং পোস্ট-ডক্টরাল পর্যায়ের ছাত্রছাত্রী ও গবেষকদের এ অনুদান প্রদান করা হয়। ভৌত, জৈব ও অজৈব বিজ্ঞান, প্রকৌশল ও পরিবেশ বিজ্ঞান, নবায়নযোগ্য শক্তি বিজ্ঞান, তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি এবং ন্যানো টেকনোলজি লাগসই প্রযুক্তি; জীববিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিজ্ঞান এবং খাদ্য ও কৃষি বিজ্ঞান এ ৩টি গ্রুপে এ ফেলোশিপ প্রদান করা হয়। ২০১০-২০১১ অর্থবছর থেকে ২০১৬-২০১৭ অর্থবছর পর্যন্ত এ খাতে প্রায় ৪৮ কোটি টাকা ব্যয়ে মোট ৭,৬০৩ জন ফেলোকে সহায়তা প্রদান করা হয়েছে।

মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করা একটি বড়ো চ্যালেঞ্জ হলেও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্ভাবনী উদ্যোগ শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম সফলভাবে সে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে। জ্ঞানভিত্তিক ও বিজ্ঞাননির্ভর জাতি ও সমাজ গঠনে এসব কর্মসূচি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে। জাতিসংঘে টেকসই উন্নয়নের (এসডিজি) জন্য ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা গৃহীত হয়েছে। ২০৩০ সালের মধ্যে এ ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী ১৬৯টি উপ-খাতভিত্তিক উন্নয়ন কর্মকাণ্ড পরিচালিত হবে। বাংলাদেশ এসডিজি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সফল ও অগ্রগামী একটি প্রধান দেশ হবে- সরকার সে লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে। বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি শিক্ষাকে এগিয়ে নিতে সরকারের এ সব উদ্যোগ বাস্তবায়নে সকলকে এগিয়ে আসতে হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উদ্ভাবনী উদ্যোগসমূহ সফলভাবে বাস্তবায়নের মাধ্যমেই এসডিজির লক্ষ্যমাত্রাসমূহ অর্জন করা সম্ভব হবে।

#

১২.০২.২০১৮ পিআইডি প্রবন্ধ

চার বছরের উন্নয়ন ও অগ্রগতি : ধারাবাহিকতা রক্ষা বড়ো চ্যালেঞ্জ

মোতাহার হোসেন

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে সরকারের দ্বিতীয় মেয়াদের চতুর্থ বছর পূর্তি হলো গত ১২ জানুয়ারি। গত চার বছরকে বর্ণনা করা যায় উন্নয়ন, অগ্রগতি, অর্জন আর সাফল্যের ধারাবাহিকতার সময় হিসেবে। নিজস্ব অর্থায়নে পদ্মা সেতু নির্মাণের সিদ্ধান্ত ছিল সরকারের জন্য বড়ো চ্যালেঞ্জ। রোহিঙ্গা ইস্যুতে শেখ হাসিনার উদ্যোগে বাংলাদেশের মানবিক অবস্থান দেখেছে সারাবিশ্ব। সরকারের এই মেয়াদে বিশ্বে উন্নয়নের রোল মডেলে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশ। এ সাফল্যের ধারাবাহিকতা ধরে রাখাই বর্তমানে বড়ো চ্যালেঞ্জ।

কঠিন এবং বন্ধুর পথ পাড়ি দিয়ে টানা দ্বিতীয় মেয়াদের ক্ষমতার চার বছর পূর্ণ করলো শেখ হাসিনার নেতৃত্বাধীন আওয়ামী লীগ সরকার। ২০০৯ সালের ৬ জানুয়ারি দ্বিতীয় এবং ২০১৪ সালের ১২ জানুয়ারি তৃতীয়বারের মতো প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নেন বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনা। সরকারের ধারাবাহিক দ্বিতীয় মেয়াদের এই সময় যুদ্ধাপরাধীদের বিচার, শিক্ষা,স্বাস্থ্য, কৃষি, বিজ্ঞান ও তথ্যপ্রযুক্তি, সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীসহ বিভিন্ন খাতের উন্নয়ন দেশের ভেতর-বাইরে প্রশংসিত হয়েছে। এক সময়ের তলাবিহীন ঝুড়ির অপবাদ পাওয়া বাংলাদেশ এখন খাদ্যে স্বয়ংসম্পূর্ণ। নিজ দেশের নাগরিক ছাড়াও বাস্তুচ্যুত ১০ লক্ষাধিক রোহিঙ্গার আশ্রয়, খাদ্য, বস্ত্র এবং সুচিকিৎসার দায়িত্ব নিতে পারে বাংলাদেশ। বিশ্লেষকদের মতে এ সবকিছুই সম্ভব হয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দৃঢ়চেতা ও সাহসী নেতৃত্বের কারণে।

বর্তমান সরকারের সময়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বিদ্যুৎ, যোগাযোগ, তথ্যপ্রযুক্তি, ক্রীড়া, পরিবেশ, কৃষি, খাদ্য, টেলিযোগাযোগ, সংস্কৃতি, সামাজিক নিরাপত্তা, মানবসম্পদসহ সকল ক্ষেত্রেই উন্নয়ন হয়েছে। বিশেষ করে দেশের দারিদ্র্য বিমোচন, পুষ্টি নিশ্চয়তা, মাতৃ ও শিশুস্বাস্থ্য, প্রাথমিক শিক্ষা, নারীর ক্ষমতায়ন ইত্যাদি ক্ষেত্রের উন্নয়ন আন্তর্জাতিক মহলে প্রশংসিত হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে গত নয় বছরে দেশ অবকাঠামো, আর্থসামাজিক প্রতিটি ক্ষেত্রে আশাতীত সাফল্য অর্জন করেছে। এ সময় মাথাপিছু আয়, রিজার্ভ, রেমিটেন্সসহ বিভিন্ন সূচকে উন্নতি হয়েছে, মেগা প্রকল্পগুলো বাস্তবায়নের কাজ অব্যাহতভাবে এগিয়ে গেছে। বর্তমান সরকারের সময় অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৫.৫৭ থেকে ৭.২৮ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। মাথাপিছু আয় ৮৪৩ থেকে ১ হাজার ৬১০ মার্কিন ডলার, বিনিয়োগ ২৬.২৫ শতাংশ থেকে ৩০.২৭ শতাংশ, রপ্তানি ১৬.২৩ থেকে ৩৪.৮৫ বিলিয়ন ডলার, রেমিট্যান্স ১০.৯৯ থেকে ১২.৭৭ বিলিয়ন ডলার, রিজার্ভ ১০.৭৫ থেকে ৩৩.৪১ বিলিয়ন ডলার এবং এডিপি ২৮৫ বিলিয়ন টাকা থেকে বেড়ে হয়েছে ১ হাজার ১০৭ বিলিয়ন টাকা।

দৃঢ় অর্থনৈতিক ভিত্তির কারণে নিজস্ব অর্থে পদ্মার ওপর ৬ দশমিক ১ কিলোমিটার দীর্ঘ সেতু নির্মাণ করার সাহস দেখাচ্ছে বাংলাদেশ। বিশ্বব্যাংক অর্থায়ন থেকে সরে যাওয়ার পর বিশাল এ প্রকল্প হাতে নেয়ার ঘটনায় অনেক দেশ ও সংস্থা সন্দেহ ও বিস্ময় প্রকাশ করলেও সে স্বপ্ন এখন দৃশ্যমান। এ ছাড়া মেট্রোরেল, এলিভেটেড এক্সপ্রেসওয়েসহ আরো কিছু বড়ো প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে সরকার। ফেনী জেলার মহিপালে দেশের প্রথম ৬ লেনের ফ্লাইওভার নির্মাণ কাজ নির্ধারিত সময়ের আগেই সম্পন্ন হয়েছে।

এক লক্ষ ১৩ হাজার কোটি টাকা খরচ করে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপন করছে বাংলাদেশ। দ্বিতীয় পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগও চলমান। রয়েছে মহাকাশ জয়ের লক্ষ্যও। দেশের প্রথম স্যাটেলাইট 'বঙ্গবন্ধু-১' আগামী মার্চে মহাকাশে উৎক্ষেপণ করার সম্ভাবনা রয়েছে। দুই হাজার ৯৬৭ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত এ উপগ্রহ সফলভাবে মহাকাশে স্থাপিত হলে বিশ্বের ৫৭তম দেশ হিসেবে নিজস্ব স্যাটেলাইটের মালিক হবে বাংলাদেশ। বছরে সাশ্রয় হবে ১৪ মিলিয়ন মার্কিন ডলার।

কূটনৈতিক সাফল্যেও পিছিয়ে নেই বাংলাদেশ। কোনোরকম যুদ্ধ-সংঘাত বা বৈরিতা ছাড়াই দুই প্রতিবেশী ভারত ও মিয়ানমারের বিপক্ষে সমুদ্র বিজয় নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ। বঙ্গোপসাগরে এক লক্ষ ১৮ হাজার ৮১৩ বর্গকিলোমিটারের বেশি টেরিটরিয়াল সমুদ্র, ২০০ নটিক্যাল মাইল এলাকায় একচ্ছত্র অর্থনৈতিক অঞ্চল এবং চট্টগ্রাম উপকূল থেকে ৩৫৪ নটিক্যাল মাইল পর্যন্ত মহীসোপান এলাকার প্রাণিজ ও অপ্রাণিজ সম্পদের ওপর সার্বভৌম অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ ছাড়া স্বাধীনতার পরপর ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে যে স্থল সীমান্ত চুক্তি হয়েছিল তা বাস্তবায়নের মাধ্যমে ছিটমহল সমস্যার সমাধান করাও বাংলাদেশের বড়ো অর্জন।

রোহিঙ্গা ইস্যুতেও আন্তর্জাতিকভাবে প্রশংসা পেয়েছে বাংলাদেশ। জাতিসংঘসহ বিশ্বের প্রায় সকল দেশ ও সংস্থা এই ইস্যুতে বাংলাদেশের পদক্ষেপের ভূয়সী প্রশংসা করে পাশে রয়েছে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পেয়েছেন 'মাদার অফ হিউম্যানিটি' উপাধি। মধ্যপ্রাচ্যের শীর্ষস্থানীয় দৈনিক খালিজ টাইমস রোহিঙ্গাদের সংকট মোকাবিলায় শেখ হাসিনার মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য তাকে 'নিউ স্টার অব দ্য ইস্ট' বা 'পূর্বের নতুন তারকা' হিসেবে আখ্যায়িত করেছে।

বৈশ্বিক রাজনীতি বিষয়ক গবেষণা সংস্থা 'পিপলস অ্যান্ড পলিটিকস' বিশ্বের পাঁচজন রাষ্ট্র ও সরকার প্রধানকে চিহ্নিত করেছে, যাদের দুর্নীতি স্পর্শ করেনি, বিদেশে কোনো ব্যাংক অ্যাকাউন্ট নেই এবং উল্লেখ করার মতো কোনো সম্পদও নেই। বিশ্বের সবচেয়ে সৎ এই পাঁচজন সরকার প্রধানের তালিকায় তৃতীয় স্থানে আছেন বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। টাইম ম্যাগাজিনের বিবেচনায় বিশ্বের প্রভাবশালী ১০ নারী নেত্রীর একজন মনোনীত হয়েছিলেন শেখ হাসিনা। কাজের স্বীকৃতিস্বরূপ তাঁকে নানা পুরস্কারে ভূষিত করা হয় বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার পক্ষ থেকে। ২০১৪ সালে ইউনেস্কো তাকে 'শান্তিবৃক্ষ' ও ২০১৫ সালে ওমেন ইন পার্লামেন্টস গ্লোবাল ফোরাম নারীর ক্ষমতায়নের জন্য তাঁকে রিজিওনাল লিডারশিপ পুরস্কার এবং গ্লোবাল সাউথ-সাউথ ডেভলপমেন্ট এক্সপো-২০১৪ ভিশনারি পুরস্কারে ভূষিত করে। বাংলাদেশের কৃষির উন্নয়নে অব্যাহত সমর্থন, খাদ্য উৎপাদনে সয়ম্ভরতা অর্জন এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নে অবদানের জন্য আমেরিকার কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয় ২০১৫ সালে তাঁকে সম্মাননা সনদ প্রদান করে। জাতিসংঘ পরিবেশ উন্নয়ন কর্মসূচি দেশে এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পরিবেশ এবং টেকসই উন্নয়নে অসামান্য অবদান রাখার জন্য লিডারশিপ ক্যাটাগরিতে শেখ হাসিনাকে তাদের সর্বোচ্চ পুরস্কার 'চ্যাম্পিয়ন অব দ্যা আর্থ-২০১৫' পুরস্কারে ভূষিত করে।

মুক্তিযুদ্ধকালীন মানবতাবিরোধী অপরাধে জড়িতদের বিচার কাজে সফলতা অর্জন করেছে বাংলাদেশ। টানা দুই মেয়াদের ক্ষমতায় বিভিন্ন প্রভাবশালী দেশ ও গোষ্ঠীর চাপ সত্ত্বেও শীর্ষস্থানীয় অপরাধীদের বিচার শেষে রায় কার্যকর করা হয়েছে। এই বিচার স্বাধীন বাংলাদেশকে কলঙ্কমুক্ত করার ক্ষেত্রে বড়ো সাফল্য।

গত চার বছরে অনেক সফলতা আসলেও এই যাত্রা মসৃণ ছিল না। এই সময়ে পিছু ছাড়েনি ষড়যন্ত্র। স্থিতিশীল রাজনৈতিক পরিবেশ নিশ্চিত করার পরেও নতুন চ্যালেঞ্জ হিসেবে এসেছে জঙ্গিবাদ। তবে সব ষড়যন্ত্র আর চ্যালেঞ্জ প্রজ্ঞার সঙ্গে মোকাবিলা করেই পথ চলেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। বছরপূর্তি উপলক্ষে জাতির উদ্দেশ্যে প্রদত্ত ভাষণেও প্রধানমন্ত্রী তাঁর সরকারের উন্নয়নের সামগ্রীক তথ্য উপাত্ত তুলে ধরেছেন। এখন সরকারের সামনে বড়ো চ্যালেঞ্জ হচ্ছে উন্নয়নের এ ধারবাহিকতা অব্যাহত রাখা। যে ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করবে ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত সমৃদ্ধ বাংলাদেশ।

#

১২.০২.২০১৮ পিআইডি প্রবন্ধ

শিশুর একাকিত্ব এবং আমাদের করণীয়

ফারহানা রহমান

এক একা বাসায় থাকতে ভালো লাগে না, সময় কাটাতে সারাদিন কম্পিউটার গেমস খেলি কিংবা টিভি দেখি- কথাগুলো ঢাকা শহরে বসবাসকারী চাকুরীজীবী মা-বাবার সন্তানের। রাজধানীর একটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের ছাত্রী সে। মা-বাবা দু'জনেই কর্মজীবী। সকালে স্কুলে দিয়ে দু'জনেই অফিসের কাজে বেরিয়ে যান। এরপর ছুটির সময় গৃহকর্মীর সাথে বাসায় আসে ছোট্ট শিশুটি। সারাদিন একা একা থাকতে খুব কষ্ট হয় তার। অসহায় বোধ করে সে।

বর্তমানে অনেক নারী বিভিন্ন পেশায় যুক্ত আছেন। তাই ইচ্ছা থাকলেও তাদের সন্তানদের পর্যাপ্ত সময় দিতে পারেন না। কর্মজীবী মায়েরা শিশুদের বাড়িতে গৃহকর্মীর কাছে রেখে যান। ফলে দীর্ঘ সময় শিশুটি গৃহকর্মীর সাথে থাকে। অনেকসময় গৃহকর্মীরা শিশুদের ঠিকভাবে যত্ন করেন না। আর একা একা বড়ো হওয়ায় শিশুরাও বিভিন্ন ধরনের সমস্যায় ভোগে।

বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপট বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, যৌথ পরিবারগুলো ক্রমান্বয়ে ভেঙে যাচ্ছে, গড়ে উঠছে একক পরিবার। আর এইসব পরিবারের শিশুরা ক্রমশ একা হয়ে পড়ছে। বেড়ে ওঠার এই প্রক্রিয়ায় শিশুরা বিভিন্ন ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছে। যৌথ পরিবারে শিশুরা অন্যের মতামত সহজেই গ্রহণ করতে পারে। অপরের সঙ্গে নিজের আবেগ অনুভূতি ভাগ করে নিতে পারে। পরস্পরের সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে শেখে। প্রকৃতপক্ষে সামাজিকতা চর্চার সুযোগ যৌথ পরিবারে বেশি ঘটে। যৌথ পরিবারে বেড়ে ওঠা শিশুর মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধ গড়ে ওঠে বেশি।

অন্যদিকে, যে পরিবারে মা-বাবা দুজনই বাইরে কাজ করেন সে পরিবারে শিশুরা একাকিত্বে ভোগে বেশি। এতে করে শিশুর বিকাশ বাধাগ্রস্ত হয়। এক্ষেত্রে কর্মজীবী মা-বাবাকে শিশুর জন্য যে সময়টুকু রাখবেন তা যথাযথভাবে ব্যবহার করতে হবে। তাদের আগ্রহের জায়গাগুলোকে চিহ্নিত করে সেদিকে বেশি নজর দিতে হবে। তাদের আবেগ-অনুভূতিকে প্রাধান্য দিতে হবে। মা-বাবা শিশুকে যতটুকু সময় দিবেন তার পুরো সময়টা তাদের দিকে মনোযোগ দিতে হবে। প্রতিনিয়ত একা থাকার ফলে শিশু হতাশায় ভুগতে শুরু করে। অন্যের কাছে মনখুলে কথা বলতে পারে না। অনেকসময় খিটখিটে মেজাজের হয়ে পড়ে। সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে।

বিষন্নতা ও হতাশায় ভুগছে এমন শিশুরা অবাধ্য আচরণ করে অনেক সময়। অনেক ক্ষেত্রে এই নিঃসঙ্গতা কাটাতে তারা বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। কিংবা মাদকাসক্ত হতে পারে। তারা প্রযুক্তিনির্ভর খেলাধুলায় বেশি আকৃষ্ট হয়। পরবর্তীতে দেখা যায়, পরিণত বয়সে এসব শিশু সামাজিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়। পারিবারিক জীবনে সফল মানুষ হতে পারে না। বর্তমান সমাজব্যবস্থায় অপরাধ বৃদ্ধি পাচ্ছে। এই কিশোর অপরাধের অন্যতম কারণ হচ্ছে শিশুদের বেড়ে ওঠার প্রক্রিয়ায়। পারিবারিক নিয়মশৃঙ্খলা যথাযথ না থাকলে এ ধরনের ঘটনা সমাজে বাড়তেই থাকে।

যেসব মায়েরা চাকুরীর জন্য বাইরে যান, সেক্ষেত্রে যদি প্রত্যেক অফিসে ডে-কেয়ার সেন্টার চালু থাকে তাহলে কর্মজীবী মায়েরা তাদের সন্তানদের সাথে নিয়ে আসতে পারেন এবং অবসর সময়ে কাজের ফাঁকে শিশুদের সাথে সময় কাটাতে পারেন। অনেক সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে স্বল্পপরিসরে যদিও ডে-কেয়ার সেন্টার চালু রয়েছে তবে তা প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। এক্ষেত্রে সরকারি ও ব্যক্তিগত উদ্যোগে ডে-কেয়ার সেন্টারের সংখ্যা বাড়ানো গেলে শিশুর বিকাশের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

যেসব পরিবারে শিশুরা গৃহপরিচারিকার কাছে থাকে, যেসব ক্ষেত্রে মা-বাবা ও পরিবারের সদস্যদের তাদের প্রতি যত্নশীল হতে হবে। গৃহপরিচারিকারা যেন শিশুদের সাথে সঠিক আচরণ করেন, সে বিষয়ে তাদের কাউন্সেলিং করা যেতে পারে। সুদৃঢ় পারিবারিক বন্ধন এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। আলাদা না থেকে পরিবারের সব সদস্য যেন একসাথে বসবাস করতে পারে সে পরিবেশ তৈরি করতে হবে। শিশুদের মোবাইল কিংবা কম্পিউটার গেমসে আকৃষ্ট হতে সাহায্য না করে দৈহিক বিকাশে সহায়ক খেলাধুলায় আকৃষ্ট করার ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন।

শিশুর স্বাভাবিক বিকাশ নিশ্চিত করতে হলে সন্তানকে অভিভাকরা যতটুকু সময় দেবেন সেটার গুণগত মান থাকতে হবে। যাতে শিশুর সাথে পারস্পরিক সম্পর্ক এবং মিথস্ক্রিয়া ঘটার সুযোগ থাকে। শিশুটি যেন বুঝে তার মা-বাবা তার পাশেই আছে এবং তাকে গুরুত্ব দেয় হচ্ছে। অনেক সময় দেখা যায়, ছুটির দিনগুলোতে মা-বাবা দু'জনই বাড়িতে থাকেন ঠিকই কিন্তু সন্তানের ইচ্ছা অনিচ্ছার দিকে না তাকিয়ে নিজেদের সমাপ্ত কাজগুলো শেষ করতে ব্যস্ত হয়ে যান। এর ফলে শিশুটি মানসিকভাবে অবহেলার শিকার হয়। এ রকম আচরণ শিশুদের সাথে কোনোভাবেই করা সমীচীন নয়। অভিভাবকরা যদি একঘণ্টা সময়ও শিশুকে দেন সেটা যেন গঠনমূলক হয়। যেন এই এক ঘণ্টার শিক্ষাটা তারা তাদের একাকী সময়গুলোতে কাজে লাগাতে পারে। আর একটি বিষয় অভিভাবকদের খেয়াল রাখতে হবে যে, কোনোভাবেই শিশুর সামনে ঝগড়াঝাটি কিংবা অস্বাভাবিক আচরণ করা যাবে না। এতে শিশুর কোমল মনে আঘাত লাগে এবং তারা এরকম আচরণের দিকে ধাবিত হয়।

আমাদের মনে রাখতে হবে শিশুর কোনো আচরণই তার নিজস্ব নয় বরং এ সমাজের অন্যান্যদের প্রতিফলিত আচরণ। সমাজ ও তাদের চারপাশ থেকে যেটা দেখে সেটাই তাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করে। তাই শিশুর আচরণ ও সার্বিক পরিস্থিতি পরিবর্তন করতে হলে সবার আগে আমাদের নিজেদের এবং চারপাশের জগৎ পরিবর্তন করতে হবে, তবেই আমাদের শিশুরা একটি সুস্থ্য-সুন্দর পরিবেশে প্রত্যাশা অনুযায়ী বেড়ে উঠতে পারবে।

#

১২.০২.২০১৮ পিআইডি প্রবন্ধ